রাধাকৃষ্ণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশনায়

হরফ প্রকাশনী ।। ঢাকা

সারা ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে সবচেয়ে প্রিয় ও পরিচিত দুটি নাম, রাধা আর কৃষ্ণ। এই দুজনের যে প্রণয়-কাহিনী, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা মেলে না।

এই প্রণয়-কাহিনী ছড়িয়ে আছে নানান পুরাণ ও কাব্যে, গ্রাম্য গাথায়, লৌকিক গানে। পরম পন্ডিত বা ভক্ত থেকে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর এই কাহিনীকে আপন করে রেখেছেন। তবে, এ পর্যন্ত বাংলা গদ্যে এই কাহিনীর নির্ভরযোগ্য, নিখাদ, সমগ্র রূপ রচিত হয়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমস্ত কাব্য মন্থন করে এই রসসমৃদ্ধ ভাষ্যটি আপন ভাষায় রচনা করেছেন।

কৃষ্ণে'র অনেক পরিচয়। বৃন্দাবনের যে-কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মতন, যিনি দুরন্ত রাখাল এবং যিনি রাধার প্রেমিক, শুধু তাঁর কথা বলা হয়েছে এখানে। আর রাধা যেন সম্পূর্ণ কাব্যেরই সৃষ্টি। এখানে এঁরা দেব-দেবী নন। কোনো অলৌকিকের প্রভাব নেই, এঁরা চিরকালের প্রেমিক-প্রেমিকা। বইটি শেষ করার পরেও একটু অতৃপ্তি থেকে যাবে, মনে হবে আর একটু কেন লেখা হলো না। এই অতৃপ্তিই এই ভালোবাসাকে অমর করেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' পাঠকরে একদিন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রকাশকবন্ধু ইফতেখার রসুল জর্জ বাংলাদেশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সকল গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্ত। শুধুমাত্র 'রাধাকৃষ্ণ' গ্রন্থটি তিনি আমায় বাংলাদেশে প্রকাশ করতে দেওয়ায় তার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আশা করি বাংলাদেশের সকল পাঠক পাঠিকার কাছেও গ্রন্থটি বিপুল ভাবে সমাদৃত হবে।

প্রকাশক

গাছগুলোর মাথায় এসে পড়েছে নতুন সূর্যের আলো, কিন্তু নীচে এখনো অন্ধকার। রাতের ঘুম এখনো ভাঙে নি, এর মধ্যে ভোর এসেছে। বাগানে শিশিরভেজা কুসুমকলি সবে মাত্র ফুটিফুটি, বাসা থেকে পাখিরা মুখ বার করে ভাবছে, ডাকবে কি ডাকবে না, একি পূর্ণ-চাঁদের জ্যোৎস্না না দিনমণির আলো? গোয়ালে গরুগুলো শিং নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে। এই সময় দূরে শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল গোয়ালিনী যশোমতীর। তড়ি-ঘড়ি উঠে পড়লো। তার স্বামী তখনো গভীর ঘুমে মগ্ন, বুকের কাছে জড়িয়ে আছে তাদের একমাত্র শিশুটিকে। শিশুটির ঠোঁটে হাসির লেখা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে হাসে।

ছোট্ট মাটির ঘরটি হাঁড়ি-সরায় ঠাসাঠাসি। ঘরের চাল থেকেও ঝোলানো রয়েছে ঝিঁক। চোখ মুছতে মুছতে যশোমতী এসে দাঁড়লো গবাক্ষের কাছে। কান খাড়া করে রইলো। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দই এগিয়ে আসছে ক্রমশ। একটি নয়, অনেক।

পক্ষিমাতার মতন ব্যাকুল হয়ে যশোমতী প্রায় ছোঁ দিয়ে ছেলেকে তুলে নিল বুকে। রাজার সৈন্য আসছে তার ছেলেকে কেড়ে নিতে। কী করে লুকোবে, কোথায় লুকোবে এই সাত-রাজার ধন এক মানিক? শিশুটি এখনো জাগে নি। যদি হঠাৎ জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে? যদি সেই কান্নার শব্দ বাইরে পৌঁছোয়?

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে যশোমতী স্বামীর কপালে হাত রেখে বললো, ওগো, ওঠো! ওঠো!

তার স্বামীর নিদ্রা সহজে ভাঙে না।

তখন যশোমতী হাত জোড় করে প্রার্থনার সুরে বললো, ওগো ঘুমঠাকুরুন, তোমার পায়ে ধরে মিনতি করি, আমার পতিকে এখন ছেড়ে যাও। আবার রাত আসুক, তখন আবার তুমি এসো। এখন আমি ওঁর চোখ খুলে দিলে অপরাধ নিও না। নিও না।

চৌপাই-এর তলায় মাটির সরায় জল রাখা ছিল। সেই জল আঁজলা ভরে নিয়ে যশোমতী ঝাপটা মারলো তার স্বামীর চোখে। একবার, দুবার, তিনবার। এদিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বেশ জোর।

নন্দ গোয়ালা বিরক্তিসূচক উঃ শব্দ করে চোখ মেললো। তারপর দেখলো, পরমান্ন-ভরা সোনার থালায় পিঁপড়ে ধরার মতন তার স্ত্রীর শান্ত, সুন্দর মুখ-ভরা উদ্বেগ। ছেলে তার পাশে নেই, মায়ের কোলে। কনুই ভর দিয়ে অর্ধেক শরীর উঁচু করে সে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে? বাছার গায়ের আবার তাপ বেড়েছে?

—ওগো না। কান পেতে শোনো! তারা আসছে।

নন্দ শুনলো। তড়াক করে এক লাফে উঠে পড়ে, দরজার কোণ থেকে সড়কিখানা হাতে নিয়ে বললো, আসুক। আমার ঘর থেকে কেউ আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবে না!

যশোমতী আরও ভয় পেয়ে গেল। একা নন্দ সড়কি হাতে রাজার সৈন্যদলের সঙ্গে লড়বে নাকি? রাজা উগ্রসেনের নিজের হাতে গড়া এই সৈন্যবাহিনী দেখে স্বয়ং মহাবল জরাসন্ধ পর্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। একথা কে না জানে এই সৈন্যরা কত নৃশংস।

শেষ পর্যন্ত যুক্তি মানলো নন্দ। সত্যি, গোঁয়ার্তুমিতে কোন লাভ নেই। যদিও তারা স্বামী-স্ত্রী নিরপরাধ, তবু রাজার উৎকট খেয়াল থেকে শিশুপুত্রকে বাঁচাবার জন্য তাকে পালাতেই হবে।

পুজোর জন্য স্থলপদ্ম আহরণ করতে গিয়ে মেয়েরা যেমন অতি সাবধানে ফুলগুলো কোঁচড়ে রাখে, তেমন সাবধানে শিশুটিকে কোলে নিয়ে নন্দ বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পেছনের উঠন পার হয়ে, লিচু আর জামরুল বাগানের মধ্য দিয়ে সে দৌড়তে লাগলো। দৌড়তে দৌড়তে পার হয়ে গেল আরও কত বাগান, তারপর ঘোর বন, সে থামলো না।

যতক্ষণ স্বামী-পুত্রকে দেখা যায়, ততক্ষণ যশোমতী দাঁড়িয়ে রইলো দরজায়, তার পর ফিরে এলো জানলার কাছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, ঠিক যেন কাঠের পুত্তলি, যদিও তার বুকের মধ্যে ঝড় বইছে।

এখন অনেক ঘোড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি ডাক, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সৈনিক পুরুষদের হাস্য-কৌতুক সবাই স্পষ্ট শোনা যায়। ক্রমে, রাজপথে ধুলো উড়িয়ে তারা দৃশ্যমান হলো, তাদের

সোনার জল করা ঝকমকে শিরস্ত্রাণ দেখলে মনে হয় ঠিক যেন নদীর জলের সকালের সূর্যকিরণ। তাদের কোমরবন্ধে তলোয়ার, পাশে গোঁজা বর্শা, তাদের দৃষ্টি বাজপাখীর মতন। রাজা উগ্রসেনের আমলের এই সেনাবাহিনী দেখলে বুকে ভরসা জাগতো, মনে হতো বাইরের যে-কোন শত্রুকেই এরা দমন করতে পারবে। উগ্রসেনের ছেলের আমলে এদের দেখলেই তরাসে বুক কাঁপে কার সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই।

একটু বাদেই ঘোষপল্লীর বিভিন্ন বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল, সৈন্যরা নানান বাড়িতে ঢুকে, জিনিসপত্র তছনছ করে খুঁজে দেখছে কোনো অল্পবয়েসী শিশু আছে কিনা। যারা পেরেছে, আগেই তারা নন্দর মতন কোলের ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে। যাদের ঘুম ভাঙেনি তাদের কপাল পুড়লো। সৈনিকদের নিষ্ঠুর হাত মা-বাবার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল শিশুপুত্র। কী অদ্ভুত খেয়াল হয়েছে নতুন রাজার, শিশুরক্ত না দেখলে তৃপ্তি হয় না।

যশোমতীর ঘরেও এলো ওরা। যশোমতী একটাও কথা বললো না, দরজা ছেড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা এসে খাট-বিছানা উল্টেপাল্টে, হাঁড়ি-সরা ভেঙে তন্নতন্ন করে দেখলো। একটা হাঁড়িতে ভরা ছিল ক্ষীরের লাড্ডু, সেগুলো নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বেরিয়ে গেল তারা। তখন যশোদা বুকের কাছে হাত জোড় করে বিড়বিড় করতে লাগলো, কত দূরে কত দূরে গেছে ওরা? ওদের কেউ দেখে নি তো? হে ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো।

এদিকে কত দূরে যে ছুটে চলেছে নন্দ, তার খেয়াল নেই। অশ্বারোহী সৈনিকদের নাগালের বাইরে যেতে হবে। এক সময় হাঁপাতে হাঁপাতে হাত পা অবশ হয়ে এলো। চারদিকে ঘোর জঙ্গল। এখানে কেউ দেখতে পাবে না। ছেলেকে কোলে রেখেই নন্দ একটা বড় গাছের গুঁড়ির কাছে বসলো।

ছেলে জেগে উঠেছে এর মধ্যে পিট পিট করে চাইছে। রীতিমতন দিনের আলো ফুটে গেছে, এক্ষুনি ছেলে কিছু খেতে চাইবে। নন্দরও খুব খিদে পেয়েছে। খিদের জ্বালায় ছেলে যদি কাঁদতে শুরু করে এখানে কী খাওয়াবে ছেলেকে! এখানে কোনো গাছের ফল কি বিশ্বাস করে খাওয়ানো যায়? নন্দ গাছগুলোকে চেনবার চেষ্টা করলো।

কয়েকটা গাছ চেনা, কয়েকটা অচেনা। কদম ফুলে ভরা গাছটি চেনা যায়, একটু দূরে দেখা যায় কয়েকটা বেল আর নারকেল গাছ, সবচেয়ে উঁচু গাছটি পিয়াল। একটি গাছের গা থেকে ভারি সুন্দর গন্ধ আসছে, এটাই কি চন্দন গাছ, আর ঐ যে গাছের গুঁড়ির রং একেবারে কালো, এটার নাম কী? লোক মুখে সেও তমাল গাছের নাম শুনেছে, এই কি সেই তমাল? হবেও বা।

ছেলে আর কোলে থাকতে চাইছে না, ছটফট করছে। নন্দ তাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হলো। দু-আড়াই বছর বয়েস। এর মধ্যেই গুট গুট করে দিব্যি দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। নন্দ চোখে চোখে রাখলো, ছেলে খেলতে লাগলো এদিক-ওদিক। ঘন জঙ্গল হলেও, আসবার পথে দু-একটা ভাঙাচুরো বাড়ি চোখে পড়েছে। হয়তো এক সময়ে এখানে কোনো নগর ছিল, কোন রাজার খেয়ালে একদিন ধ্বংস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, একটা মিষ্টি কুলকুল শব্দ। নিশ্চয়ই নদী আছে কাছকাছি কোথাও!

নন্দর মাথায় চিন্তা এলো। গোকুল ছেড়ে এখানে এসে বাড়ি বানিয়ে থাকলে কেমন হয়? রাজার সৈন্যরা কি আর ইদিকে আসবে? এ-জায়গাটা ভারি সুন্দর, থাকার পক্ষে বেশ। কাছাকাছি নদী যখন আছে, তখন গোচারণের তৃণভূমিও থাকবে অবশ্যই। ফেরার সময় ভালো করে দেখে যেতে হবে তো!

দুপুরের আগে ফেরা নিরাপদ নয়। এর মধ্য কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। ছেলেটা এখনো কান্না জুড়ে দেয় নি। রোজ সকালে উঠে দুধ-ননী খাওয়া তার অভ্যেস। নতুন জায়গায় এসে দিব্যি খেলায় মেতে উঠেছে। কোথা থেকে ময়ূরের পালক কুড়িয়ে পেয়ে খলখল করে হাসছে। নন্দ সতর্ক চোখে তাকালো। ময়ূর অতি হিংস্র পাখি। বাচ্চা ছেলে দেখলে চোখ ঠুকরে দেয়।

ছেলে একটা ঝোপের আড়ালে চলে যেতেই নন্দ উঠে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলো। সেই সময় দূরে কর্কশ শব্দে একটা ময়ূর ডাকলো। নন্দ আর আকাশের দিকে তাকাবারও সময় পেল না; হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলো।

সে কি অঝোর বৃষ্টি! কোথায় লুকিয়ে ছিল এত মেঘ, দিব্যি তো রোদ খটখট করছিল। আকাশ জুড়ে যেন লক্ষ ভাল্লুকের দঙ্গল

হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে একটা ঘন পাতাওয়ালা গাছের নীচে আশ্রয় নিল নন্দ। কিন্তু সে-বৃক্ষও বেশীক্ষণ আশ্রয় দিল না। এক সময় সেখানে দ্বিগুণ বেগে জল পড়ে। ভিজে-নেয়ে একশা হয়ে গেল বাপ আর ছেলে। নন্দ ছেলেকে মুড়ি দিয়ে রেখেছিল নিজের গায়ের উড়নি দিয়ে। সেই ভিজে ত্যানা বারবার সরিয়ে ছেলে বৃষ্টির জলে হাত ঘোরায়। এখনো একবারও কাঁদে নি। তবু নন্দর বুকের মধ্যে খুব যাতনা হয়. ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বারবার। এইটুকু ছেলে, জলে ভিজে যদি সান্নিপাতিক হয়। স্নেহের যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো, তাহলে নন্দ তার শিশুপুত্রের মাথার ওপর চন্দ্রাতপ খাটিয়ে দিত এখুনি।

নন্দরা ইন্দ্রের পূজারী। একবার ইচ্ছে হলো, হাত জোড় করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে বর্ষণ বন্ধ করে দেবার জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু হাত উঠলো না। খরাঅজন্মার বৎসরের বিভীষিকার কথা তার মনে পড়ে। ইন্দ্রদেব সদয় হয়েই বৃষ্টি দিয়েছেন। মাঘ মাস শেষ হয়ে গেছে, এখন বৃষ্টি হলে রাজা এবং দেশের পুণ্য হয়। হায় রাজা। তার কোপন স্বভাবের জন্যই আজ নন্দকে চোরের মতন পালিয়ে এসে এই আশ্রয়হীন অরণ্যে ছেলেকে নিয়ে ভিজতে হচ্ছে।

প্রায় এক দণ্ড পরে বৃষ্টির তেজ কমতে লাগলো একটু একটু করে। গাছতলা ছেড়ে নন্দ ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো, উড়ুনিটা নিংড়ে মাথা মুছে দিল ছেলের। বড় দীন গলায় জিজ্ঞেস করলো, খুব খিদে পেয়েছে নারে?

ছেলে বললো, খুব আর একটু।

নন্দ বললো, এই তো এখুনি বাড়ি যাবো, তোর মা তোকে খেতে দেবে. দুধ, ননী, সর, মোয়া, নারকেল-নাড়ু—আর কী খাবি?

ছেলে বললো, আর জল খাবো!

নন্দ বললো, আহারে, আহারে, এত বৃষ্টিতে ভিজেও জলের তেষ্টা মিটলো না! দেখি কপালটা? একটু যেন গরম গরম? নাকি মনের ভুল।

ছেলের ডান হাতের আঙুল ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়ে নন্দ সবেমাত্র বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করেছে, এই সময় একটু দূরে শুনতে পেল গান। রিনরিনে কচি গলা। একটি নয়, তিন-চার

জনের। এখানে এ বিজন বনে কে গান করে? এখানে কি অপ্সরারা গোপনে খেলা করতে আসে? অপ্সরাদের চোখের সামনে পড়ে গেলে যদি কোনো অপরাধ হয়।

ক্রমে দেখা গেল চারটি মেয়ে হেলে দুলে নাচতে নাচতে আসছে বনের পথে। তাদের ন-দশ বছরের বেশী বয়েস নয়, পিঠের ওপর চুল খোলা, কাঁচা সোনার মতন বর্ণ, গন্ধরাজ ফুলের মুখশ্রী। যেন সত্যিই চারটি অপ্সরা কিংবা বনবালা।

মেয়ে চারটি হঠাৎ নন্দকে দেখে ভয় পেয়ে বললো, ওমা।

নন্দ কণ্ঠস্বরে অনেকখানি কাকুতিমিনতি মিশিয়ে বললো, ভয় পেয়ো না, বাছারা, কিছু ভয় নেই।

ওরা আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

নন্দ ওদের আরও একটু আশ্বস্ত করার জন্য বললো, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এই পথে যাচ্ছিলাম। আমার নাম নন্দ গোপ, আমার ছেলের নাম কানু। তোমারা এই বনের মধ্যে দিয়ে কোথায় যাচ্ছো? তোমরা কি মানবী, না দেবী?

মেয়েরা এবার ফিক করে হাসলো। এ ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো, এই, তুই বল না, এই, তুই বল না।

তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ফুটফুটে, যার মুখখানিকে পদ্ম বলে ভুল করে মৌমাছি এসে বসতে পারে, সে কোকিলজয়ী কণ্ঠে বললো, আমি বৃষভানু রাজার মেয়ে, আমার নাম রাধা। আর এরা আমার সখী। আমরা যমুনায় ব্রত পারণ করতে যাচ্ছি।

নন্দ উৎফুল্ল হয়ে বললো, ওমা, তুমি বৃষভানুদাদার মেয়ে! এর মধ্যে কত ডাগরটি হয়েছো! তোমার বাবাকে আমার কথা বলো, উনি চিনতে পারবেন।

নন্দর আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে আরও বললো, আমিই তো তোমার বাবা আর মায়ের বিয়ে দিয়েছি!

কানু ততক্ষণে বাবার হাত ছাড়িয়ে মেয়েদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি মেয়ের কোঁচড়ে বাতাসা আর ফুটকড়াই ছিল, ঠিক তা নজর করে সেদিকে হাত বাড়িয়েছে। মাটিতে পড়ে গেল কয়েটি বাতাসা।

নন্দ তা দেখে বড় লজ্জা পেল। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বললো, আমার বাছার বড় খিদে পেয়েছে, ওকে দুটি বাতাসা দেবে মা?

এক সখী বললো, এ যে আমরা ব্রতের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ব্রত না হয়ে গেলে কী করে দেবো?

কানু তবু কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। তা দেখে রাধা বললো, আহা দুটো বাতাসা দে, বৃন্দে! ব্রতে কি আর সব লাগে!

ঝপ্ করে সে কানুকে কোলে তুলে নিল।

নন্দ ব্যস্ত হয়ে বললো, দেখো, দেখো, রাখতে পারবে না, বড় দুরন্ত ছেলে।

রাধা বলল, আহা, এইটুকু ছেলেকে কোলে রাখতে পারবো না!

আদর করে সে কানুর গালে একটু হামি দিয়ে বললো, ইস, কী সুন্দর ছেলেটি, টানা টানা চোখ, তিলফুলের মতন নাক। দ্যাখ দ্যাখ বিশাখা, কীরকম খুট্ খুট্ করে হাসছে!

অন্য সখীরাও আদর করলো কানুকে। কানুর এক হাতে তখনও সেই ময়ুরপালকটি ধরা। রাধা সেই পালকটা গোল করে মুড়ে কানুর মাথায় পরিয়ে দিল। তারপর বললো, কী সুন্দর মানিয়েছে না? ঠিক যেন স্বর্গের রাজপুত্তুর!

ছেলের প্রশংসায় সব সময়ই গর্ব হয় নন্দর। সে একটা তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে বললো, তোমাকে দেখেও আমার আজ বড় আনন্দ হলো, মা! অনেকদিন যাইনি তোমাদের পাড়ায়। তোমার বাবাকে আমার কথা বলো। যদিও এখন এদেশের রাজা কংস। তবু তোমার বাবাকেও আমরা রাজা বলি। বড় মানুষ না হলে রাজা হওয়া যায় না, তোমার বাপ সত্যিকারের বড় মানুষ। তোমার মা কেমন আছেন?

—ভালো।

—যেমন লক্ষ্মী শ্রীময়ী তোমার মা, তেমনটিই তুমি হয়েছো। জানো, আমি একবার কান্যকুব্জে তীর্থ করতে গেছি, রাজপথে একটি কিশোরীকে দেখলাম, যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। লোকের কাছে খোঁজ করে জানলাম ও হচ্ছে জলন্দরের রাজকন্যা। অমন রূপবতী মেয়ে আমাদের এ-দেশ ঘাটে একটিও দেখিনি। মনে মনে ভাবলাম, আহা, এমন মেয়েকে যদি আমাদের ওদিকে বৌ করে

আনা যায়! বুক ঠুকে গেলাম ভলন্দর রাজার দরবারে। সরলভাবে বললাম, হে রাজন, আপনার কন্যা কলাবতীকে আপনি আমাদের রাজ্যে সম্প্রদান করুন। ব্রজের রাজা সুরভানুর ছেলে বৃষভানু অতি সুযোগ্য পাত্র। রাজকুমার বৃষভানু রূপেগুণে অদ্বিতীয়! যেমন তার উদার হৃদয়, তেমনি পরাক্রম! তাই শুনে ভলন্দররাজ বললেন, আপনি যখন বলছেন, চলুন একবার চোখে দেখে আসি ছেলেটিকে। যদি ললাটলিখন থাকে সেখানেই আমার মেয়ের বিয়ে হবে। তারপর সত্যি সত্যি রাজপুত্রী কলাবতীর সংগে যুবরাজ বৃষভানুর পরিণয় হয়ে গেল। তা হলে দেখলে মা, তোমার বাবা-মায়ের বিয়েতে আমিই ঘটকালি করেছিলাম?

একটু থেমে, রাধার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে নন্দ বললো, ভাবছি আর একটা বিয়েতেও আমি ঘটকালি করবো।

বয়স্ক লোকেরা গল্প শুরু করলে সহজে থামে না। রাধার সখীরা চঞ্চলা হয়ে উঠেছে। একজন রাধাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললো, ও লো রাই, জল সইতে যাবি নে? সূর্য যে মাথার ওপর উঠলো!

নন্দ ব্যস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ মা, তোমরা কটি বালিকা যে এই বনপথ দিয়ে যাও, তোমাদের ভয় করে না? দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই! তা ছাড়া কাছে কংসের সৈন্যরা।

রাধা বললো, আমরা তো এদিক দিকে প্রায়ই যাই। আমাদের তো কেউ কিছু বলে না।

নন্দ বললো, তুমি মা রাজার ঝিয়ারী, তোমার নাম শুনলেই সবাই সমীহ করবে। আমি সামান্য গোয়ালা, তাই সব সময় আতঙ্কে থাকি! বড় উৎপাত শুরু করেছে কংসের সেনারা। তবে শুনেছি, ওরা শুধু পুরুষশিশুদেরই ধরে নিয়ে যায়, মেয়ে-শিশুদের কিছু বলে না! আমার কানুকে যে কত কষ্টে রক্ষা করি! এমন প্রতাপ রাজা কংসের যে ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোরাও তাকে ভয় পায়। কতবার কতো প্রেতিনী, ডাকিনী দানো পাঠিয়েছে আমার কানুকে মারবার জন্য! ভাবছি এবার গোকুল ছেড়ে চলে যাবো! এই বনের মধ্যে এসে ঘর বানিয়ে থাকলে কেমন হয়?

রাধা বললো, আসুননা, তাহলে আমাদের বাড়িরও কাছাকাছি হবে।

—এখান থেকে ব্রজপুরী কতটা দূর ?

—এক ক্রোশ খানেক !

এ-জায়গাটার নাম কী ?

—এ-বনকে তো সবাই বৃন্দাবন বলে।

—বাঃ, সুন্দর নাম ! আমি বললে আমার প্রতিবেশীরাও আমার সঙ্গে চলে আসতে রাজী হবে। এখানেই হবে আমাদের গয়লাপল্লী।

বিশাখা উতলা হয়ে বললো, ও রাই, চল না ! কত দেরি হলো যে।

নন্দ বললো, হ্যাঁ মা, আর তোমাদের আটকাবো না। এই কান চল বাড়ি যাবি না ? দিব্যি কোলে চড়ে বসে আছিস যে ! নাব !

আর একবার শিশু কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করে কোল থেকে নামিয়ে দিল বালিকা রাধা।

গোকুল ত্যাগ করে চলে এসেছে নন্দ আর তার আত্মীয়, পরিজন, প্রতিবেশী। বৃন্দাবনে গড়ে উঠেছে নতুন আভীরপল্লী। কংসের চেলা-চামুণ্ডা ও সৈন্যদের উপদ্রবও কমেছে অনেকটা। যে-সন্দেহের বশে কংস শিশু নিধনে মেতেছিল, হয়তো সে-সন্দেহ দূর হয়ে গেছে তার মন থেকে। তাই এখন অন্যান্য দুরাচারে মন দিয়েছে।

একটু বড় হয়েছে কানু। এখন সে নিজেই একা মাঝে মাঝে বাইরে ছুটে যায়। দেখতে পেলেই যশোমতী ছুটে গিয়ে তাকে ধরে আনে। বড় দুরন্ত ছেলে হয়েছে সে। তাকে শাসন করাও যায় না। তাকে বকুনি দিলে, এমনকি মারলেও সে কাঁদে না, ঝরঝরিয়ে হাসে কিংবা এমন মুখভঙ্গি করে যে শাসনকারীরও হাসি এসে যায়। বাড়িতে তারজন্য ক্ষীর-ননী কিছুই জমিয়ে রাখার উপায় নেই। সে তো নিজে যতখুশী খেতেই পারে, সে-সম্পর্কে কোনো কার্পণ্য নেই যশোমতীর, তবু ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করার দিকেই ছেলের ঝোঁক। দুপুরে যখন যশোমতী ঘুমিয়ে থাকে, তখন কানু পাড়ার এক দঙ্গল শিশুকে জড়ো করে মায়ের সব হাঁড়ি-কলসী হাতড়ায়, কোনোটা ভাঙে, ক্ষীর ননীতে মাখামাখি করে হাতমুখ। একদিন এমন নরম এমন স্নেহময়ী যশোমতীও এমন রেগে গিয়েছিলেন যে কানুর দু হাত বেঁধে রেখেছিলেন দুটো গাছের সঙ্গে। তার ছেলে মুক্তি পাবার জন্য কান্না জোড়ে নি।

নন্দ কানুকে কোনোদিন বকে না। ছেলে আর মায়ের খুনসুটি সে কৌতুকের চোখে দেখে। সে এখন অনেক নিশ্চিন্ত।

ঘোষপাড়ার মধ্যে নন্দর অবস্থা অতি সাধারণ। তার চেয়ে ক্ষমতাবান ও সঙ্গতিসম্পন্ন গোপ আরও অনেক আছে। তবু নন্দর ধীর স্বভাব ও সহজ সততার জন্য অনেকেই তাকে মান্য করে। নন্দর খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই জীবনে। সেবাপরায়ণ স্ত্রী ও সুকুমার পুত্রকে নিয়ে তার যে ছোট্ট পরিবার, তাতেই সে খুব তৃপ্ত।

একদিন নন্দ গেল ব্রজপুরীতে বেড়াতে। প্রকাণ্ড একটা দিঘির সামনে বৃষভানু রাজার প্রাসাদ। সিংহদ্বারের দু পাশে দুটি মঙ্গলঘট বসানো। সে-ঘট দুটি এমন চকচক করে যে সকলে বলে সোনার।

ঐ-রাজপ্রাসাদের দ্বারীরা প্রসন্নবদন, তারা কঠোরভাবে কারুকে দূরে ঠেলে দেয় না।

রাজা বৃষভানু নন্দকে খুব সমাদর করলেন। তাকে এনে বসালেন একেবারে অন্দরমহলে। পুরনো বন্ধুর মত আরম্ভ করলেন সুখ-দুঃখের গল্প। এলেন রানী কলাবতী। এই প্রাসাদে শান্তি ও পরিতৃপ্তির একটা স্নিগ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়। অলক্ষ্মী এদিককার ছায়া মাড়াতেও ভয় পেয়েছে।

এক সময় রাধা এসে বসলো বাবা-মায়ের পাশে। তাকে দেখে নন্দর চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন মেয়ে যাদের থাকে, সেই বাপ-মায়ের কত আনন্দ। শুধু আনন্দ? দুশ্চিন্তাও থাকে না?

রাধা এখন বারো বছরের কিশোরী। আয়ত চোখ দুটির ওপর স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে ঘন পল্লব। চম্পক বর্ণ আরও ফেটে পড়েছে। পিঠ ছেয়ে আছে মেঘবর্ণ চুল। মুক্তাপাঁতির মত ঝকঝকে দাঁত।

রাধার কাছে রাজা বৃষভানু নন্দর পরিচয় দিতে যেতেই নন্দ বললো, ওকে তো আমি চিনি। একদিন বনের পথে দেখেছিলাম। ওর টানেই তো এলাম। কী মা, আমাকে মনে নেই?

রাধা ঠিক মনে করতে পারলো না।

নন্দ মনে করিয়ে দিল, সেই যে সেদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, আমার সঙ্গে ছিল আমার ছেলে, খুব ছোট্ট।

তখন মনে পড়লো রাধার। ছেলেটিকে মনে আছে, কী সুন্দর চোখ! নন্দ রাধার এত প্রশংসা করতে লাগলো যে লজ্জায় সে একেবারে নুয়ে পড়লো।

বেশীক্ষণ বসলো না রাধা। দূর থেকে রাই, রাই বলে ডাকতে ডাকতে এলো তার সখীরা। এখন মালা গাঁথার সময়। একটু পরেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে, তার জন্য মেয়েরা মালা গাঁথবে।

রাধা উঠে যাবার পর নন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আহা, এমন সোনার পুত্তলি, সে-ও কোথায় চলে যাবে।

বৃষভানু চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কেন, একথা বলছো কেন?

নন্দ বললো, রাজা, আপনার মেয়ে বয়স্থা হয়েছে, এবার তো তাকে পাত্রস্থ করতেই হবে।

বৃষভানু বললেন, তা ঠিক, ইদানীং আমি এবং রানীও এ-সম্পর্কে চিন্তা করছি। কিন্তু যোগ্য পাত্র কই?

—আপনার মেয়ের যোগ্যপাত্র সত্যিই দুর্লভ। মেয়ে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। একমাত্র স্বয়ং নারায়ণের হাতেই একে সমর্পণ করা যায়।

রানী কলাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা ভাবলে তো চলে না। কন্যারত্ন বেশী দিন পিতামাতার সংসারে থাকবে না, এটাই বিধান। আপনার কাছে কোনো সৎপাত্রের সন্ধান আছে নাকি?

—আপনার মতন রাজার মেয়ের সঙ্গে···

বৃষভানু বাধা দিয়ে হেসে বললেন, আমি আর রাজা কোথায়! ছোটখাটো একটা জমিদারি আছে, লোকে আদর করে রাজা বলে।

—আমাদের কাছে আপনি রাজাই।

কলাবতী বললেন, যাই বলো বাপু আমি কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে কোনো রাজপুত্রেরই বিয়ে দেবো।

—রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হওয়াই প্রথা। আপনারা কি কংসের কোনো ছেলের সঙ্গে শ্রীমতী রাধার বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন?

বৃষভানু তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে বললেন, না।

নন্দর মুখে একটা কৃতজ্ঞভাব ফুটে উঠলো। স্বস্তির সঙ্গে সে বললো, রাজা, এ আপনারই যোগ্য উত্তর দিয়েছেন। অত্যাচারী কংসের সঙ্গে যদি আপনি বৈবাহিক সম্পর্ক পাতাতেন, তাহলে শান্তি-প্রিয় সাধারণ মানুষ আপনাকেও সামাজিকভাবে বর্জন করতো। এখন যারা আপনাকে শুল্ক দেয় না, তারাও আপনাকে শ্রদ্ধা করে। সে শ্রদ্ধার আসন আপনি হারাতেন!

বৃষভানু বললেন, সে প্রশ্নই ওঠে না। জেনেশুনে আমার মেয়েকে আমি কোনো রক্তলোলুপ শ্বশুরের পরিবারে পাঠাতে পারি না।

—সেই জন্যই তো বলছিলাম, এই সোনার পুতুলি কত দূরে চলে যাবে কে জানে! কাছাকাছি আর রাজা কিংবা রাজপুত্র কই।

কলাবতী বললেন, আর্যাবর্তে কি রাজপুত্রের অভাব?

নন্দ বললো, কংসের আত্মীয় জরাসন্ধও মহাপ্রতাপশালী রাজা যদি তাঁর কোনো ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চান—

বৃষভানু আবার দৃঢ়ভাবে বললেন, না। আপনার সন্ধানে আর কোনো রাজপুত্র নেই?

—আমি অনেকদিন তীর্থ ভ্রমণে যাই না. অন্যদেশের সংবাদ রাখি না।

রানী কলাবতী তাঁর স্বামীকে বললেন, তুমি নানা দিকে দূত পাঠিয়ে সন্ধান নাও। আর বেশীদিন অপেক্ষা করা চলে না।

হঠাৎ নন্দর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে কলাবতীর উদ্দেশ্যে বললো, রানী, আমি আপনাদের বিয়েতে ঘটকালি করেছিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আপনাদের কন্যার বিয়েতেও আমিই ঘটকালি করি।

—সেই কথাই তো আমরাও বলছি আপনাকে। একটি ভালো পাত্রের সন্ধান দিন না!

—আমার হাতে সত্যিই একটি উত্তম পাত্র আছে। তার সঙ্গে বিয়ে দিলে আপনার মেয়ে দূরে কোথাও যাবে না, কাছাকাছিই থাকবে। এমন রূপ-গুণের ডালি যে আপনার মেয়ে, সে দূরদেশে চলে যাবে, এটাই আমার মন চায় না।

কলাবতী বললেন, আমরাও তো সেই কথাই বলি। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ একটিমাত্র মেয়ে আমাদের, তাকে চোখের আড়াল করার কথা ভাবতেই পারি না। আপনি কোন্ পাত্রের কথা বলছেন?

তাম্বুলদান থেকে নন্দ একটা তাম্বুল তুলে নিয়ে মুখে পুরলো। তারপর ধীরে সুস্থে চিবিয়ে, গলা পরিষ্কার করে, দায়িত্বশীল ব্যক্তির মতন ভারিক্কি ভাবে বললো, শুনুন, বিয়ের ব্যাপারে কন্যা চায় রূপ, মা চায় বিত্ত, বাবা চায় কুলশীল, আর আমাদের মতন সাধারণ লোক চায় মিষ্টান্ন খেতে। এখন আমি যে ছেলেটির কথা বলছি, সে খুবই রূপবান, যেন যুবা বয়সের শিব, আপনার মেয়ের সঙ্গে খুবই মানাবে। মেয়ের তাকে একটুও অপছন্দ হবে না। আর বিত্ত, সে তা খুব বিত্তশালী নয়, রাজা কিংবা রাজপুত্রও নয়, তবে যথেষ্ট সচ্ছল, নিজের উদ্যমে সে অনেক কিছু গড়ে

তুলেছে। সে আপনাদেরই স্বজাতি, ব্যবহারটি অতি চমৎকার, যেমন তার আত্মসম্মানজ্ঞান, অথচ তেমনই বিনীত ও মধুরভাষী, খুব কালীভক্ত—প্রতিদিন মায়ের পূজো না করে সে জলস্পর্শ করে না ··

রাজা ও রানী সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কে? ছেলেটি কে?

নন্দ বললো, আমার স্ত্রী যশোমতীর সম্পর্কে ভাই হয় ছেলেটি। তার নাম আয়ান। ঘোষপাড়ার সবাই তাকে খুব ভালোবাসে।

রাজা বৃষভানু হঠাৎ উৎকট গম্ভীর হয়ে গেলেন। রানী কলাবতী মুখ ফেরালেন অন্যদিকে।

নন্দ জানতো, এমনি হবে। রাজদুহিতার সঙ্গে কি সামান্য গোয়ালার বিয়ে হয়? কিন্তু সে-রকমও তো হয়েছে কখনো কখনো। মহাবল দক্ষরাজার মেয়েরও তো বিয়ে হয়েছিল শ্মশানচারী শিবের সঙ্গে। রূপে-গুণে আয়ান কোন রাজার ছেলের চেয়ে কম কিসে? যদি ভাগ্যে থাকে সেও একদিন রাজা হবে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রাজা বৃষভানু তাকিয়ে রইলেন অলিন্দের বাইরে। তারপর একটি বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দিঘির জলে আর একটুও রোদ্দুরের আলো নেই। এবার আমার পূজাগৃহে যাবার সময় হলো।

অর্থাৎ এবার নন্দকে উঠে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। রানী কলাবতী গাত্রোত্থান করে বললেন, আমিও যাই, এখনি নাপতেনী আসবে আলতা পরাতে।

নন্দ বুঝেও বুঝলো না। বললো, একদিন আয়ানকে ডাকি তাহলে? ছেলেটিকে একবার দেখলে—

রানী তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরও দু-চারটি পাত্র দেখুন, হঠাৎ এক কথায় তো বিয়ে হয় না। পাঁচ জায়গায় দেখতে হয়—

—রানীমা, আমি আর একটি কথা বলে যাই। মেয়েকে সৎপাত্রে দেওয়াই পিতা-মাতার দায়িত্ব। অনেক রাজপুত্রও কুলাঙ্গার হয়। আমাদের আয়ানের ঠিকুজী দেখে একজন মস্ত গণকঠাকুর একবার বলেছিলেন, এ-ছেলের একদিন রাজকন্যা লাভ হবে। সেটা

মনে পড়লো বলেই সম্বন্ধের কথা বললাম। কে জানে, হয়তো আপনার মেয়ের সঙ্গেই ঐ ছেলের নিয়তি বাঁধা আছে। নিয়তি তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। আপনারও সুবিধে হবে, মেয়ে কাছাকাছি থাকবে, যখন ইচ্ছে তাকে দেখবেন, যখন ইচ্ছে তাকে বাড়িতে আনবেন। মেয়ের ঠিকুজীটা অন্তত একবার মেলান ওর সঙ্গে।

বৃষভানু বললেন, আচ্ছা দেখি!

রাজপুরী থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে নন্দ দেখলো, মন্দিরের সিঁড়িতে বসে রাধা তখনও তার সখীদের সঙ্গে বসে মালা গাঁথছে। আবার চক্ষু ভরে দেখলো নন্দ। কী রূপ! এই মেয়ে একাই ব্রজ-বৃন্দাবন আলো করে রাখবে। একে কি দূরে কোথাও পাঠানো যায়?

বৃষভানু রাজার পুরী পার হয়ে আসবার পর একটি বেশ বড় মাঠ। মাঠটির মাঝখান দিয়ে রথচক্রের দাগে দাগে একটা পথ তৈরি হয়ে গেছে। একটি মাত্র বড় গাছ রয়েছে সেখানে। মাঝে মাঝে সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসী আস্তানা গাড়ে। কাছেই একটা ডোবা। অনেকে বলে ঐ ডোবার জল খেলে হজম শক্তি বাড়ে। নন্দ এক আঁচলা জল খেয়ে নিল।

বাড়িতে এসে নন্দ মহা উৎসাহের সঙ্গে যশোমতীকে বললো, জানো, আজ একটা বিয়ের সম্বন্ধ করে এলাম। উঃ কতবড় ধুমধাম যে হবে!

যশোমতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কার সঙ্গে কার বিয়ে? তোমার কি ঘটকালির নেশা ধরলো নাকি?

তোমার ভাই আয়ান, তার সঙ্গে বৃষভানু রাজার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি।

যশোমতী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, সেকি কথা! তোমার যেমন কাণ্ড! আগে আমাকে একটু জিজ্ঞেস করবে তো!

—কেন, কেন, কী হয়েছে? আমাদের গয়লাপাড়ায় একজন রাজকন্যা আসবে, আমাদের কতবড় সৌভাগ্য!

—কিন্তু আয়ান যে বিয়েই করবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। সে বলেছে, সারাজীবন ব্রাহ্মচারী হয়ে থাকবে।

নন্দ এবার হো-হো করে হেসে ফেললো। হাসতে হাসতে বললো, যুবাবয়সে অনেকেই প্রথম প্রথম ঐ কথা বলে। বৃষভানু রাজার মেয়েকে তো দেখো নি। ঠিক যেন একটি হীরের ফুল। তাকে দেখলেই আয়ানের মাথা ঘুরে যাবে।

যশোমতী তবু চিন্তিতভাবে বললো, না গো না! আয়ানের একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ। বড় গোঁয়ার ছেলে। এর আগে কত ভালো ভালো ঘরের মেয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু বিয়ের কথা শুনলেই সে রেগে যায়।

নন্দ এবার একটু রেগে উঠে বললো, তোমার যেমন মেয়েছেলের বুদ্ধি। অন্য-অন্য মেয়ের সঙ্গে রাধার তুলনা? রাধার সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তাহলে সেটা আয়ানের সাত পুরুষের ভাগ্যি। এখনো ওঁরা রাজী হবেন কিনা ঠিক নেই।

যশোমতী তবু মুখে আশঙ্কা নিয়ে বললেন, তা যাই বলো, শুধু শুধু তোমার কেন এর মধ্যে মাথা গলানো! আয়ান এসে আমাদের ওপর রাগারাগি করবে।

সত্যি তাই হলো। দিন দু-এক পরেই দুপুরবেলা পা দুপদুপিয়ে আয়ান এসে হাজির এ-বাড়িতে। মুখে তার গনগনে রাগ।

অন্যরা যখন গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে আসে, তখন আয়ান আসে নি। তার অনেক বড় বাড়ি, বিশাল বাথান, সে-সবের মায়া ত্যাগ করে চলে আসা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন তার অনুচরও সেখানেই থেকে গেছে। এখনো গোকুলে একটি গোপপল্লী রয়ে গেছে। আশেপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামের মানুষ আয়ানকে এক ডাকে চেনে।

উঠোনে ধুলোবালি নিয়ে খেলা করছিল কানু। তাকে এক ধমক দিয়ে আয়ান বললো, এই কী করছিস! ওঠ্! সারা গায়ে ধুলো মেখেছে একেবারে! তোর বাবা কোথায়?

—তোর বাবাকে ডাক। তুই আমাকে চিনিস? আমি তোর এক মামা হই। বাবাকে গিয়ে বল্, আয়ানমামা এসেছে।

গলার আওয়াজ শুনে নন্দ আর যশোমতী এর মধ্যেই বেরিয়ে এসেছে। নন্দ কৌতুক করে বললো আরে, আরে, বড় কুটুম যে! হঠাৎ পথ ভুলে নাকি? তোমার মতন ব্যস্ত মানুষ যে আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছে—

আয়ান বললো, আপনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলতে এসেছি।

—তা তো বলবেই। আগে এসো বসো, পান-তামাক খাও! তারপর তো কথা হবে। আগে থেকেই অত রাগ রাগ ভাব কেন?

যশোমতী ঘরের দাওয়ায় আসন পেতে দিল দুটি। নন্দ আয়ানকে পাশে বসিয়ে বললো, তোমার শরীর-মন সব ভালো তো! পিতামাতার মঙ্গল তো? ধেনুগুলি যথেষ্ট দুগ্ধবতী আছে তো?

আয়ান সে-সব কথায় না গিয়ে সরাসরি বললো, আপনি আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন কেন, হঠাৎ?

নন্দ অতি নিরীহ সেজে বললো, কেন, কেন, কী হয়েছে? আমি তোমাকে বিপদে ফেলবো, একি হতে পারে?

—তাহলে দুদিন ধরে অনবরত বৃষভানু রাজার কাছ থেকে লোক আসছে কেন আমার কাছে? একবার এসে আমার ঠিকুজী চাইছে, একবার এসে আমাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে, এসব কী?

—তাহলে তো মনে হচ্ছে, তোমার ভাগ্যটা খুলেছে। রাজার পছন্দ হয়েছে তোমাকে। এতে রাগের কি আছে?

—আমি রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করি না।

নন্দ মুচকি হেসে বললো, বাবাজীবন, রাজা-রাজড়াদের পছন্দ না হলেও রাজকন্যাকে তো পছন্দ হতে পারে! তুমি বৃষভানুর কন্যা রাধাকে কি দেখেছো সম্প্রতি?

আয়ান আবার রেগে উঠে বললো, আমি ঠিকই বুঝে-ছিলাম, এ-সব আপনারই কীর্তি। লোকমুখে শুনেছি, আপনিই কয়েকদিন আগে ব্রজপুরীতে গিয়েছিলেন। রাজার কানে কিছু মন্তর দিয়ে এসেছেন। আমাকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন? আমি নিজের বিষয়কর্ম নিয়ে পরিবৃত আছি—

—শোনো আয়ান, শ্রীমতী রাধার সঙ্গে তোমার পরিণয় হলে তোমার সংসারে আরও শ্রীবৃদ্ধি হবে !

—আমি চাই না সে-সব। আপনিও শুনুন, যদি সম্বন্ধ পাতাতেই আপনার সাধ যায়, তাহলে বৃন্দাবনে-গোকুলে আরও অনেক সমর্থ ছেলে আছে, তাদের কারুর কথা ভাবুন, আমাকে নিষ্কৃতি দিন। দিদি, তোমার পতিটিকে নিবৃত্ত করো না !

যশোমতী বললো, আমি বাপু কিছু বলিনি। বারণই করেছিলাম—নন্দ বললো বৃন্দাবন-গোকুলে তোমার মতন আর কে আছে আয়ান ? তুমিই তো রূপে গুণে সবার সেরা ! তুমি ছাড়া আরকেউ তো শ্রীমতী রাধার যোগ্য হতে পারে না !

প্রশংসা শুনে একটু মুখের ভাব বদলালো আয়ানের। তবু সে বললো, আমার বিয়ে করার অসুবিধে আছে।

—কিসের অসুবিধে ? ব্যবস্থাপত্তর সব আমরাই করবো !

—সে কথা নয়। বিবাহে আমার রুচি কিংবা বাসনা কিছুই নেই।

—সে কথা কি বললে চলে। সংসারধর্ম সকলকেই করতে হয়। এতো আর যেমন-সেমন বিয়ে নয়, ঘর আলো করে রাজকন্যা আসবে—

—আমি মহামায়ার পূজারী, সংসারধর্ম আমার না-করলেও চলে—

—ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো। আর একটা কথা বলি। রাজা কংসের বিষ নজর আছে আমাদের ওপরে। এখন আবার রাজা বৃষভানুকেও চটানো ঠিক হবে না। বরং, ব্রজের রাজার সঙ্গে আমাদের একটা কুটুম্বিতা হলে রাজা কংসও আর আমাদের ওপর অত্যাচার করতে চাইবে না সহসা। এ-সব দিক তো ভাবতে হয় গোষ্ঠীস্বার্থের জন্য তুমি যদি··· ···

—অন্যের স্বার্থের কথা ভেবে আমাকে বিয়ে করতে হবে নাকি ?

—আয়ান, তোমার ওপর আমাদের অনেক ভরসা ! রাজা কংস আমাদের বিরোধী। রাজা বৃষভানুকেও চটানো আমাদের পক্ষে মোটেই ঠিক হবে না !

বিষণ্ণ মুখে আয়ান বললো অগ্রজাপতি, আপনি সত্যিই আমাকে দারুন চিন্তায় ফেলে দিলেন !

গোয়ালঘরের কাছ থেকে একটা বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছিল, সেদিকে হঠাৎ খেয়াল করে আয়ান জিজ্ঞেস করলো, কে বাঁশি বাজায় ?

নন্দ বললো, আমাদের ছেলে কানু বাজাচ্ছে। ক'দিন ধরেই দেখছি, রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে একটা আড় বাঁশি জোগাড় করে খুব ফুঁ ফাঁ দিচ্ছে।

সপ্রশংসভাবে আয়ান বললো, বাঃ, এর মধ্যেই বেশ মিষ্টি সুরটা তুলেছে তো !

রাজা কংসের এক খুড়তুতো বোন নাম দেবকী। তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বসুদেবের। কংস বিয়ের পরও বোনকে কাছ-ছাড়া করেনি। ভগ্নীপতিকে ঘরজামাই করে রেখেছে। রাজপ্রাসাদে নয় অবশ্য, কারাগারে, সেখানে দেবকী-বসুদেবের যত্নআত্তির কোনো অভাব নেই, অনেকগুলি রক্ষী তাদের দেখাশুনো করে। কিন্তু কারাগারের বাইরে এক পা-ও যেতে পারে না।

দেবকী ছাড়াও বসুদেবের আর এক স্ত্রী আছে, তার নাম রোহিণী। একমাত্র পুত্রকে নিয়ে রোহিণী থাকে আভীর পল্লীতে। স্বামী সঙ্গ-বঞ্চিতা রোহিণী বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশেন না। তাঁর দুঃখ নিয়ে তিনি একলা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন বছরের পর বছর।

একদিন সেই রোহিণী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এলেন যশোমতীর বাড়িতে। রোহিণীর ছেলেটির ফুট-ফুটে ফর্সা রং, চেহারায় বেশ একটা নাদুস-নুদুস ভাব। চলেও খানিকটা হেলে-দুলে। এমনিতে বেশ হাসি-খুশি ধরনের। কিন্তু হঠাৎ একবার রেগে উঠলে তাকে আর সামলানো যায় না। তার এখন বছর তের বয়েস।

সেই সময় গোরুগুলোকে মাঠে চরাতে নিয়ে যাবার জন্য গোয়াল থেকে বার করছিল কানু। মশা তাড়াবার জন্য গোয়ালঘরে ধুনো দেওয়া হয়েছিল, সেই ধুনোর ধোঁয়ার মধ্যে কানু যেন একেবারে মিশে রয়েছে।

কানু এখন দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর। হাত-পা রীতিমতন সবল। শ্রাবণ মাসের মেঘের মতন গায়ের রং, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কপাট বুক, খাঁজ-কাটা কোমর, বয়সের তুলনায় তাকে দেখায় অনেক বড়। সে আগে দুরন্ত ছিল, এখন দুর্দান্ত হয়েছে। তাকে নিয়ে যশোমতীর সব সময় ভয়।

যশোমতী সপুত্র রোহিণীকে দেখে একটু অবাক হয়েছে। রোহিণী তো কখনো কারুর বাড়িতে আসে না। রোহিণী রোগা হয়ে

গেছে অনেক, মাথার চুলগুলোতে জট বেধে গেছে, কেমন যেন তপঃক্লিষ্ট চেহারা।

যশোমতী কানুর জন্য জলখাবারের পুঁটলি বেঁধে দিচ্ছিল, রোহিণীকে দেখে আসন পেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। গোরুগুলো নিয়ে কানু বেরিয়ে আসার পর রোহিণী তাকে ডেকে বললেন, বাছা, এদিকে একটু শুনে যাও তো!

কানু কাছে আসতে রোহিণী স্নেহের সঙ্গে তার মস্তক আঘ্রাণ করলেন। তারপর নিজের ছেলের দিকে দেখিয়ে বললেন, বাছা কানু, ইটি তোমার বড় ভাই হয়, একে প্রণাম করো!

কানু আর যশোমতী দু'জনেই অবাক। বৃন্দাবনের সব বালকই সবার ভাইয়ের মতন। এতে নতুন কিছু নেই। তবে রোহিণীর কথার মধ্যে কেমন যেন একটা হুকুমের সুর আছে।

যাই হোক, মাতৃসমা এক নারী আদেশ করেছেন বলে কানু টিপ করে একটা প্রণাম সেরে ফেললো।

রোহিণী আবার বললেন, আজ থেকে যখন তোমরা গোষ্ঠে ধেনু চরাতে যাবে, তখন একেও সঙ্গে নিয়ে যাবে!

বিস্ময় ভেঙে যশোমতী বললো, বাঃ কী সুন্দর ছেলেটি তোমার দিদি! কনকচাঁপার মতন গায়ের রং, মুখ-খানি যেন চাঁদের টুকরো। স্বয়ং চাঁদ যেন এসে জন্ম নিয়েছে তোমার ঘরে। কি নাম তোমার ছেলের?

রোহিণী বললেন, এর নাম সঙ্কর্ষণ। ডাক নামও আছে দুটো। কেউ বলে বলরাম, কেউ বলে বলাই।

যশোমতী বললো, বাঃ, বলাই নামটাই তো সুন্দর। আমার কানুর সঙ্গে বেশ মিলে যাবে। কানাই আর বলাই! আমার ছেলে জন্মাবার কয়েকদিন পরেই তো গর্গসাধু এসে উপস্থিত! গর্গ সাধুকে চেনো তো দিদি? আমি ভাবলাম যাক, ভালোই হলো। সাধুবাবাকে বললাম, আমার ছেলের একটা নামকরণ করে দাও। সাধু অমনি বললেন, নাম রাখো শ্রীকৃষ্ণ। আমরা তো এমন নাম আগে কক্ষনো শুনিনি। ছেলের গায়ের রং একটু ময়লা, তা বলে নামও সেই রকম রাখতে হবে? যাই হোক, সাধুর কথা তো আর ফেলতে

পারি না! কিন্তু অত খটমট নাম তো সব সময় উচ্চারণ করা যায় না, তাই আমরা বলি কানাই, কখনো বলি কানু।

রোহিণী ভূমির দিকে চক্ষু রেখে বললেন, আমি জানি, গর্গমুনি আমার ছেলেরও নামকরণ করে গেছেন। কিন্তু বোন, গর্গমুনি তোমাকে আর কিছু বলেন নি?

যশোমতী থতমত খেয়ে বললো, না তো! মানে সাধু তো অনেক কথাই বলেছিলেন, উনি বেশ কথা বলতে ভালোবাসেন, তুমি কোন কথাটা বলছো দিদি?

রোহিণী উত্তর দেবার আগেই হৈ হৈ করে উপস্থিত হলো ছেলের দঙ্গল। যে-যার বাড়ির গোরু নিয়ে এসেছে মাঠে চরাবার জন্য। তারা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, এই কানু, যাবি না? আয়! সূর্যি যে মাথায় চড়লো! কানু চঞ্চল হয়ে গোরুগুলির দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে বললো, মা, যাই? খাবারের পুঁটলি কই দাও!

রোহিণী তাঁর ছেলেকে বললেন, বলাই তুমিও সঙ্গে যাও! ছোট-ভাইকে চোখে চোখে রাখবে।

বলাইয়ের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল কানু। যশোমতীর চোখে শঙ্কার ছায়া। প্রতিদিনই ছেলে বাইরে যাবার সময় তাঁর এই রকম ভয় হয়। অতি দুরন্ত ছেলে, তায় বাইরে আবার শোনা যাচ্ছে নাকি কালীদহে মস্ত বড় একটা অজগর সাপ এসেছে।

যশোমতী ছুটে গেল উঠোনের বেড়ার ধারে। কাতর গলায় বললো, কানু, সাবধানে থাকবি কিন্তু! তুই ধেনুগুলোর আগে আগে কিছুতেই যাবি না! ওরে পরানের পরান নীলমণি, আমার শপথ রইলো, মনে থাকে যেন! পথে অনেক তৃণাঙ্কুর আছে, দেখে যাস কিন্তু। আর কারু নামে যে বড় ধেনুটা আছে, সেটা ক্ষেপে গেলে তুই যেন তার শিং ধরে থামাতে যাস্ না! মনে থাকে যেন! মাঠে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসবি, গায়ে বেশী রোদ্দুর লাগাস নি, তাহলে আমারও গা পুড়ে যাবে।

কানু অতি শান্ত ছেলের মত জননীর প্রতিটি অনুরোধের উত্তরেই বলতে লাগলো, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা।

মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে ধেনুর পাল নিয়ে ছেলেরা চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

যশোমতী আবার আস্তে আস্তে ফিরে এলো আঙিনার কাছে। যোগাসনের ভঙ্গিতে মেরুদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন রোহিণী। চোখের দৃষ্টি তীব্র। দেখেই কীরকম যেন গা ছমছম করে যশোমতীর। ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা কাঁসার রেকাবিতে কয়েকটা মিষ্টি সাজিয়ে, পাথরের গেলাসে জল ভরে এনে রোহিণীর সামনে রাখলো। তারপর বিনীতভাবে বললো, দিদি তুমি গর্গ-সাধুর কথায় কী বলছিলে?

রোহিণী বললেন, যাক্, তিনি যখন কিছু বলেন নি, তখন আর বলার দরকার নেই।

—কী কথা দিদি, কোনো গোপন কথা?

—সময় হলে জানবে!

—রোহিণী দিদি, হঠাৎ এতদিন বাদে তুমি আমাদের বাড়িতে এলে, তোমার ছেলেকে বললে কানুর দাদা—এর মানে কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রোহিণী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যশোমতীর দিকে। তারপর ধমক দেবার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কিছুই জানো না?

যশোমতী থরথরিয়ে উত্তর দিল, না, কিছুই বুঝলাম না?' এর মধ্যে কি কোনো গুহ্য কথা আছে? আমার ভয় করছে, এই দেখো, আমার বুক কাঁপছে। কত বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি ছেলেকে—

রোহিণী এবার একটু নরম হলেন। যশোমতীর বাহুস্পর্শ করে বললেন, ভয় নেই বোন! তুমি, আমি, আরো অনেকে একটি খুব বড় কার্যসাধনের নিমিত্ত হয়ে আছি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি তার কিছু কিছু জানো। জানো না' যখন, তখন এখন আর জেনে কাজ নেই। জানালে, তোমার অবস্থাও আমার মতন হবে, এমনি শুকনো কাঠ হয়ে যাবে। তার চেয়ে, তুমি রসে-বশেই থাকো। তোমার স্নেহসুধা উছলে দাও! সেই চরম সময় তো একদিন আসবেই—

এদিকে গোপপল্লী ছাড়াতে না ছাড়াতেই কানু নিজ-মূর্তি ধরলো। গায়ের উড়নিটা জড়িয়ে বাঁধলো কোমরে। সেখানে ছোরার মতন

গুঁজে নিল তার আড়বাঁশিটা। তারপর কারু নামে যে বিশাল বলীবর্দটি ধারালো শিং নিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, কান লটপটিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, সেটির শিং চেপে ধরে লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে বসলো কানু। জিভ উল্টিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ! ইঃ-রে-রে-রে-রে—

বলীবর্দটির পেটে হাঁটুর চাপ দিতেই সেটা জোর কদমে দৌড়োলো। অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল অনেকখানি। অন্য রাখালরা চেঁচাতে লাগলো। যাসনে, যাসনে ওরে কানু, যাসনে—। কে শোনে কার কথা।

একেবারে যমুনার ধারে একটা উঁচু ঢিবির সামনে এসে থামলো কানু। লাফ দিয়ে নীচে নামলো। অন্যরা এখন অনেক পেছনে পড়ে আছে। অদূরেই ঘন সবুজ তৃণভূমি। সেই তৃণভূমির গা ঘেঁষেই ভাঙছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে যমুনার ছোট ঢেউ। ঢিবিটার ওপরে উঠলে দেখা যায়, ডান পাশে, খানিকটা দূরে বড় কদমগাছটার নিচে খেয়াঘাট। আজ বুঝি হাটবার, তাই খেয়াঘাটে এখন বেশ ভিড়, মাথায় পসরা নিয়ে গোপিনীরা দাঁড়িয়ে আছে পার হবার অপেক্ষায়।

অন্য রাখালরা এসে পৌঁছোবার পর গোরুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো ঘাসবনে। যার যার জলখাবারের পুঁটুলি সব জড়ো করে রাখা হলো এক কদমতরুর তলায়। যমুনায় নেমে ওরা হাত মুখ ধুলো। তারপর সুদাম বললো, আজ কী খেলা হবে রে?

এক একদিন এক এক রকম খেলা জমে। কোনো দিন দেব-দৈত্যি, কোনোদিন গজ-কচ্ছপ, কোনোদিন শুম্ভ-নিশুম্ভ, কোনোদিন নাগযজ্ঞ। শ্রীদাম বললো, আজ ভাই রাজা-প্রজা খেলা হোক। এই খেলাটায় মারামারি নেই। অন্যদিন আমি বড্ড মার খাই!

সুবল বললো, ঠিক আছে, সেই খেলাই হোক। আমি তবে রাজা হবো।

কানু তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, যারে! তোর তো চেহারাই প্রজার মতন, তুই কী রাজা হবি?

মধুমঙ্গল বললো, তা হলে কে রাজা হবে?

কানু নিজের বুক বাজিয়ে বললো, 'আমি! তাছাড়া আবার কে?'

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। অনেক জনের অনেক রকম কথা, ঠিক বোঝা যায় না। সুবল চেঁচিয়ে বললো, না ভাই, কানু কেন

রোজ রোজ রাজা হবে ? আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি ? কানু কি আমার মতন ভেল্কি দেখাতে পারে ? সে কি আমার মতন নানারকম সাজতে পারে ?

কানু তার উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, তাহলে তুমি বহুরূপী সেজে রথের মেলায় ভেল্কি দেখাও গে ! রাজা সাজার অত সখ কেন ? যে সবাইকে জয় করে, সেই রাজা হয় ?

—আহা, তুই যেন আমাদের সবাইকে জয় করে বসে আছিস আর কি !

কানু আবার নিজের বুকে গুম গুম করে কিল মেরে বললো, কোন্ প্রতিযোগিতায় কে আমার সঙ্গে জিততে পারে, আয় দেখি !

রাখাল বালকদের মধ্যে অংশুমানকেই সবচেয়ে লম্বা চওড়া দেখায়। তার পাশে দাঁড়ানো মধুমঙ্গলের পেটটি কিছু নাদা হলেও গায়ে বেশ শক্তি। নবাগত বলরামের শক্তি যে কতখানি তা কেউ জানে না।

কোমরে গোঁজা আড়বাঁশিটা হাতে নিয়ে কানু বললো, আমি এটাকে যমুনায় ছুঁড়ে দেবো, দেখি কে এটা আগে তুলে আনতে পারে।

বাঁশিটা সজোরে ছুড়ে দিল কানু, সেটা অনেকখানি দূরে গিয়ে ঝপ্ করে জলের মধ্যে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাঁচ-সাতজন রাখাল বালক।

যদিও এদের মধ্যে কানুই সবচেয়ে ভালো সাঁতার জানে, তবু সাবধানের মার নেই। যাতে হঠাৎ কেউ তার থেকে আগে না চলে যায়, সেইজন্য সে ডুবো সাঁতারে গিয়ে শ্রীদামের পা ধরে টান লাগালো, মধুমঙ্গলের ঘাড় ধরে চুবুনি খাইয়ে দিল। তারপর বাঁশিটা নিয়ে সগর্বে ফিরে এলো সবার আগে !

সুবল বললো, আচ্ছা দেখি, এই কদম বৃক্ষটির একে-বারে মগডালে সবচে আগে কে উঠতে পারে ?

কথা শেষ হতে না হতেই ছেলেরা লাফিয়ে উঠে গাছের ডাল ধরলো। কানু তো সকলের আগে উঠবেই, তবু সাবধানের মার নেই। সুদাম কানুর থেকে একটা উঁচু ডালে পা দিতেই কানু সে ডালটায় হাত দিয়ে ধরে এমন ঝাঁকুনি লাগালো যে সুদাম বেচারা

পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে কোনোক্রমে নীচের ডালটা ধরে জীবন বাঁচালো। আর অংশুমান গায়ের জোরে কানুকে ঠেলে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই কানু একটা লাল-পিঁপড়ের বাসাভেঙে ছেড়ে দিল তার গায়। তারপর হাসতে হাসতে সে গিয়ে মগডালে উঠে বসলো।

তাতেও শান্তি নেই। সেইখান থেকে কানু চেঁচিয়ে বললো, এবার যে-যেখানে আছি সেখান থেকে এক লাফ দিয়ে মাটিতে নামতে হবে, কে কে পারবে?

এ কথায় সব রাখালেই শিউরে উঠলো। এত উঁচু থেকে লাফালে হাত পা ভাঙবে নিশ্চিত। কানু বসে আছে সবচেয়ে উঁচুতে। তার মুখেই এই প্রস্তাব।

কানু বললো, আমি গুনছি—চন্দ্র, পক্ষ, নেত্র, চতুর্বেদ।

তারপর সত্যি সে লাফ দিল। সে একাই শুধু। ঘন পাতাওয়ালা কদম গাছের ডালপালায় গুঁতো খেতে খেতে সে নীচে পড়তে লাগলো।

তবু ভাগ্য যে নীচের মাটি বৃষ্টি-ভেজা নরম ছিল। কানু সেখানে ধপ করে পড়ার পর সবাই ছুটে এলো তার কাছে। বলরাম এসে কানুর মাথাটা কোলে তুলে নিল। কিন্তু কানু মিটিমিটি হাসছে। তার লাগে নি।

অন্য দুটো খেলায় কানু কৌশল করে জিতেছে বলে যদিও কারুর কারুর প্রতিবাদ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এরপর কেউ আর মুখে রা কাড়লো না। এবার সবাই বুঝে গেছে যে, অন্তত সাহসে কানুই সবার সেরা।

বলরাম গম্ভীরভাবে বললো, কা-কানুই রাজা হ-বে!

সব রাখলেরা চোখাচোখি করলো। এতক্ষণে তারা ধরতে পেরেছে, বলরাম কেন এত কম কথা বলে। সে একটু তোত্-লা।

উঁচু ঢিবিটার ওপর এক জায়গায় আরও কিছু মাটি ফেলে সিংহাসন বানানো হলো। সেখানে বসানো হলো কানুকে।

মধুমঙ্গল বললো, আমাদের রাজার মুকুট কোথায়? সুবল, বললো, আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

সুবল হাতের কাজ বেশ ভালো জানে। ছদ্মবেশ ধারণেও বেশ ওস্তাদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে লতাপাতা পাকিয়ে তার সঙ্গে কদমফুল জুড়ে বেশ একটা মুকুট বানিয়ে ফেললো।

কিন্তু সেটা পছন্দ হলো না কানুর। সে বললো, আমার ময়ূরের পালকের মুকুট চাই।

যমুনা তীরে ময়ূরের পালকের অভাব কী? একটু জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে কয়েকটা টাটকা পালক নিয়ে এলো সুবল। সেগুলোকে গোল করে, লতার বাঁধন দিয়ে বেশ একটা মজবুত ধরনের মুকুট তৈরি হয়ে গেল।

সুবল যখন সেটা কানুর মাথায় পরাচ্ছে, তখন কানু আস্তে আস্তে বললো, খুব ছোটবেলায় একজন আমার মাথায় এ রকম একটা ময়ূর পালকের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল।

—কে?

—কী জানি! তার নাম মনে নেই, মুখ মনে নেই। শুধু মনে আছে তার হাত দুখানির কথা, আর গায়ের গন্ধ।

—কী রকম হাত?

—তোর মতন এরকম কোঠো কোঠো আর শক্ত নয়। কী সুন্দর নরম আর রাঙা রাঙা। ঠিক যেন করমচার মতন। আর গায়ের গন্ধে যেন চন্দনের সুবাস। মনে হয় যেন সেই গন্ধ আমার কতকালের চেনা। যেন আমার আগের জন্ম, তারও আগের জন্মে ঐ গন্ধ পেয়েছি।

—আহারে কানু, তোর যে দেখছি চক্ষু বুজে আসছে!

সঙ্গে সঙ্গে কানু পূর্ণ চোখ মেলে কটমট করে তাকিয়ে বললো, এবার আমি হুকুম জারি করছি, সবাই মন দিয়ে শোনো! প্রজারা, সবাই দেখে এসো, আমাদের গোষ্ঠরাজ্যে কোনো শত্রু ঢুকেছে কিনা! আগে দক্ষিণ দিকে যাও।

সব রাখাল বালক ছুটলো দক্ষিণ দিকে।

একটু পরে ফিরে এসে দেখে কানু দিব্যি খাবারের পুঁটলি খুলে সিংহাসনে বসে খাওয়ায় মন দিয়েছে! তাদের দেখে কানু আবার হুকুম দিল, দক্ষিণ দেখে এসেছো? এবার উত্তর দিকে যাও। সবাই যাবে।

রাখালরা উত্তর দিকও ঘুরে এসে দেখলো, কানু তখনও খাচ্ছে। নিজের পুঁটুলি ছাড়াও আরও তিন চার-জনের খাবার শেষ করেছে।

তা দেখে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। কানু হাসতে হাসতে বললো, তোরা আর একটু দেরি করতে পারলি নে? তা হলে সব কটা পুঁটুলি শেষ করতাম?

সুবল বললো, এবার তুই সত্যিই খাঁটি রাজা হয়েছিস রে কানু! প্রজার অন্ন মেরে রাজা নিজের পেট মোটা করে।

কানু বললো, তোদের বিপদ-আপদ হলে আমিই তো লড়াই করবো। তাই আমার গায়ের জোর করে নিচ্ছি।

এমন সময় ঘাস বনের দূর প্রান্তে একটা বিশ্রী হ্যাঁক্কো-হ্যাঁক্কো-হ্যাঁক্কো ধরনের কলরব শোনা গেল। সকলে উৎকর্ণ হলো এবং বুঝতে দেরি হলো না।

এদিকে মাঝে মাঝে বুনো গাধার খুব উৎপাত হয়। এদের বড় বড় দাঁত, গায়েও খুব জোর। গোরু বা মানুষ সামনে যাকেই পায় অমনি ঢুঁসো মারে আর শক্ত পায়ের চাঁট দেয়। গোরুগুলো বড্ড ভয় পায় এদের।

রাখালরা চেঁচিয়ে বললো, রাজামশাই, ঐ তো শত্রু এসেছে। ঐ তো শত্রু!

কানু লাফ দিয়ে উঠে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিতে গেল।

তার আগেই বলরাম বললো, তু-তুই থাক কানু, আমি দেখছি!

বলারাম তীরবেগে ছুটে গেল ঘাস বনের মধ্যে। তার-পরেই দেখা গেল সে একটা বুনো গাধার দু পা ধরে মাথার ওপর তুলে বনবন করে ঘোরাচ্ছে। অতবড় একটা প্রাণীকে ওরকম ভাবে উঁচু করে তোলা—সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো বলরামের কতখানি গায়ের জোর। বলরাম গাধাটাকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলের মধ্যে।

তখন কানুও সদলবলে ছুটে গেল। শুরু হলো ঘাস বনের মধ্যে এক খণ্ড যুদ্ধ। গোঁয়ার গাধাগুলো শুধু সামনেই এগিয়ে আসে, সহজে পিছু হটতে জানে না। কানু লাঠির বাড়ি মেরে মেরে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগলো। অন্য রাখালরাও তাদের পাচনবাড়ি দিয়ে পেটাতে লাগলো ধপাধপ শব্দে। শেষ পর্যন্ত গাধাগুলো রণে ভঙ্গ দিল, বলরাম ও কানুর হাতে প্রাণও দিয়ে গেল কয়েকটি।

পরিশ্রান্ত রাখালরা আবার ফিরে এলো টিবিটার কাছে। যেটুকু খাবার অবশিষ্ট ছিল, ভাগ করে খেতে বসলো সবাই। কানু এই অবসরে তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। সত্যি বড় মিষ্টি সুর তুলতে শিখেছে ছেলেটা, সারাদিন সে যত দুরন্তপনাই করুক, সন্ধ্যেবেলা শ্মশানের ধারে এক সাধুর কাছে ঠিক নিয়মিত সে বাঁশি শিখতে যায়। তার সুরের লহরী ছড়িয়ে পড়ছে বহুদূর পর্যন্ত। এমনকি তার বাড়িতে যশোমতীর কানে গিয়েও পেঁছোয়। সেই বাঁশির শব্দ শুনে মা যশোমতী খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

কৈশোর ছাড়িয়ে কানু এখন সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সে এখন ছটফটিয়ে মরে। ব্রজ-বৃন্দাবনের সব মানুষ এখন দুর্দান্ত-দুঃসাহসী হিসেবে কানুকে এক ডাকে চেনে। অনেকেই তাকে ভয় পায়।

সবচেয়ে বেশী ভয় মা যশোমতীর। এক সময় কানুর বিপদের কথা ভেবে যশোমতী ভয় পেত কংসের সৈন্য দৈত্যি-দানোর। এখন তার ভয়, কানু নিজেই কবে কোথায় কোন্ গন্ডগোল বাধিয়ে বসে।

রাখাল দলের সকলেই তার বশ্যতা পুরোপুরি মেনে নিয়েছে। কানু এখন তাদের একচ্ছত্র অধিপতি। একমাত্র বলরামই কোন দিন কানুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামেনি, বরং ছোট ভাই হিসেবে তাকে সস্নেহ প্রশ্রয় দেয়, কানুর যে-কোনো কাজে সে নিঃশব্দে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

শুধু রাখালি করে তাদের আর আশ মেটে না। তারা এখন নৌকো বায়, ওপারের হাটে গিয়ে উপদ্রব করে। শোনা যায়, তারা হাটের দোকানী-পসারীদের কাছ থেকে নানান ছুতোয় সওদা-পত্তর কেড়েকুড়ে নেয় মাঝে মাঝে। আলটপ্কা কোনো বিদেশী পথিককে নাজহাল করে ঠেলা দিয়ে। ক্রমেই কানুর অহমিকা বাড়ছে।

এক অপরাহ্নে কানু সদলবলে ফিরছে গোষ্ঠ থেকে, এমন সময় দেখলো আভীরপল্লীর বাইরে, প্রান্তরের মধ্যে একটি বেশ বড় পুজার আয়োজন চলেছে। বয়স্ক পুরুষ ও নারীরা সেখানে সমবেত, সকলেরই পরনে পট্টবস্ত্র। বড় বড় কাঠের বারকোশে সাজানো রয়েছে ফলমূল। আর কত রকম ক্ষীর-ছানা-নবনীর মিষ্টান্ন। নরম মাটিতে সার দিয়ে দিয়ে ধূপকাঠি পোঁতা। সেগুলিকে ঘিরে গোল করে সাজানো অসংখ্য মাটির প্রদীপ। এত আয়োজনেও সব কিছু সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো অনেক বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে পুজার সম্ভার।

পুরুষেরা একটু দূরে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুগেড়ে বসা। সকলেরই যুক্তকর। তাদের মাঝখানে বেশী করে চোখে পড়ে আয়ান গোপকে। তার সুঠাম বলশালী শরীর, উন্নত মস্তক। ডান বাহুতে বাঁধা একটা সোনার তাগা। তার মুখখানি থমথমে গম্ভীর। ইদানীং আয়ান কারুর সঙ্গে মেশে না। ক্বচিৎ তাকে জনসমাগমে দেখা যায়। তার কোনো প্রিয় সুহৃদ নেই, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও সে প্রায় সম্পর্ক ছেদ করেছে। আয়ানের এই পরিবর্তনের মর্ম কেউ বুঝতে পারে না। শুধু পূজো-আচ্চার ব্যাপারেই তার উৎসাহ এখনো কমেনি।

রাখালেরা সবাই একধারে দাঁড়ালো। কৌতুক দেখার ভঙ্গিতে কানু কোমরে হাত দিয়ে রয়েছে। ফিসফিস করে সে সুদামকে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ এ সব কী হচ্ছে রে?

পূজা স্থানের মাঝখানে একটা লাঠি পোঁতা। সেই দিকে ইঙ্গিত করে সুদাম বললো, ঐ যে দেখছিস না, ওটার নাম ইন্দ্রযষ্ঠি। আজ ইন্দ্রের পুজো হবে।

—কেন?

—পরপর দু বছর যে খরা গেল! ইন্দ্রের পুজো না করলে আর বৃষ্টি হবে না!

কানু এমন জোরে হা-হা করে হাসলো যে অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো তার দিক। অনেক ভুরু কুঁচকে গেল।

বন্ধুরা কানুর গা টিপে বললো, এই চুপ, চুপ। অত জোরে হাসিস না। পুজোর জায়গায় হাসতে নেই!

কানু বললো এমন মজার কথায় হাসবো না? পুজো করলে আবার বৃষ্টি হয় নাকি? বৃষ্টি তো হয় মেঘ থেকে। আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই, বৃষ্টি হবে কী করে?

—ইন্দ্র সদয় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

—কচু আর ঘেঁচু হবে!

—এই চুপ, চুপ?

এক সময় ইন্দ্রের পুজা ছিল গোপপল্লীতে প্রতি-বার্ষিক। ইদানীং একটু আলগা পড়ে গিয়েছিল। পর পর দু' বছর অতিশয় খরা

হবার ফলে আবার সকলের টনক নড়েছে। সকলেই অপরাধী হয়ে ভেবেছে যে পুজায় অমনোযোগের জন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ইন্দ্রের দয়া না হলে আকাশে সজল মেঘ আসে না। তাই এবার পুজায় ধুমধাম একটু বেশী।

একটুক্ষণ থেমে রইলো কানু। তারপর আবার বললো, কত ভালো ভালো খাবার দেখেছিস, দেখেই আমার ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে!

— ছিঃ, ও তো দেবতার জিনিস। ওর সম্বন্ধে লোভ করতে নেই!

— দেবতা কি নিজে এসে এসব খাবেন নাকি? দেবতা কি একা এত খাবার খেতে পারে? আমার এদিকে পেট চুঁইচুই করছে যে।

প্রবীণ পুরুষরা ইতিমধ্যে অনেকেই চক্ষু বুজে মন্ত্র পাঠ শুরু করেছে। তাদের বিঘ্ন ঘটছে কানুর কথাবার্তায়।

নন্দ ঘোষ দূর থেকে কানুকে দেখতে পেয়ে উঠে এলো। ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে বললো, কানু এখানে গোল-মাল করো না। মাটিতে বসে পড়ো তোমরা সবাই। হাত জোড় করে মন্ত্র বলো!

কানু উদ্ধতভাবে বললো, বাবা, এসব পুজোটুজো করে কী হয়!

নন্দ বললো, ওসব আবার কী কথা? ইন্দ্রের পুজো করা আমাদের বংশের নিয়ম। ইন্দ্রদেব সদয় হলে পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হবে, তাতে ভূমি উর্বরা হবে। ভালো ফসল না হলে মানুষ সুখে-শান্তিতে বাঁচবে কী করে? চুপ করে বসো!

কানু তবু বসলো না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, এসব মন্ত্রতন্ত্র শুনে কি ইন্দ্রদেবতা নিজে আসবেন এখানে?

— নিজে আসবেন কেন? তিনি বৃষ্টি পাঠাবেন!

— তাহলে এত খাবার-দাবার কার জন্য? বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে যাবে যে!

নন্দ তর্কবাগীশ নয়। অন্যেরা যাতে তার ছেলের ওপর বিরক্ত না হয়, সেইজন্যই সে কানুকে শান্ত করতে এসেছে। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে, তার ওপর পিতার ব্যক্তিত্ব আরোপ করার চেষ্টা করে বললো, এসব দেবতার ভোগ! বৃষ্টি পাঠাবার আগে ইন্দ্র নিজে এসে এই ভোগ গ্রহণ করে আমাদের কৃতকৃতার্থ করবেন!

— কতক্ষণের মধ্যে? কত পল? কত দন্ড?

—আঃ চুপ করে বসো না! এত কথা কেন?

কানু মানলো না। কিছুক্ষণ মাত্র সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো। মন্ত্রের গুঞ্জন চলছে তো চলেছেই। তার কানে একঘেয়ে লাগছে। আকাশের কোনো প্রান্তে মেঘের দেখা নেই। কিছুক্ষণ তার একটু কৌতূহল ছিল। সত্যিই আকাশ থেকে ইন্দ্রদেবতা নেমে এসে এইসব খাবার খেয়ে যাবেন কিনা দেখার জন্য সে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। এখন তাকাতে ঘাড় আর চোখ ব্যথা হয়ে গেছে। আর কিছুই ভালো লাগছে না। দেবতা-টেবতা আসবে ত···।

কানুর সত্যিই খিদে পেয়েছে খুব। উঠতি বয়সের খিদে সব সময় দাউ দাউ করে জ্বলে; সামনে খাবার দেখলে আরও বেড়ে যায়। যশোমতীও এখানে রয়েছেন, এখন বাড়ি গেলে তাকে কেউ খাবার দেবে না।

এক সময় সে পূজাস্থলের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লো। চেঁচিয়ে বললো, মিথ্যে কথা! কোনো দেবতা এসে এ-সব খাবার ছুঁয়ে দেখবে না। রাখালসেনা! তোমরা এসো, এই খাবার ভাগ করে নাও!

নিজেই সে দেবতার প্রসাদ আগে মুখে পুরে দিল।

রাখালসেনারা তার কথায় অবাধ্য হতে পারে না। তারাও হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লো মাঝখানে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। ফুল বেলপাতা মাড়িয়ে, কাঠের বারকোশ-গুলো উল্টে পায়েস-পিষ্টক ক্ষীর-নবনী সব লুটেপুটে চেটেপুটে সাফ করে দিল।

আয়ান পা দিয়ে ভূমি আছড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার গনগনে মুখ দেখলে মনে হয়, এক্ষুনি সে এই ধৃষ্ট বালকদের টুঁটি চেপে ধরবে। কিন্তু সে জিতক্রোধ, অস্থির হাত দুটি বুকের ওপর আড়া-আড়ি করে রাখলো, তারপর সে নন্দ ঘোষের সামনে এসে বললো, গ্রজাপতি, আপনাকেই এর দায়ভাগ নিতে হবে!

আয়ান আর দাঁড়ালো না। বিপর্যস্ত পূজাস্থল তৎক্ষণাৎ ছেড়ে সে চলে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নন্দ আর যশোমতীর চোখে ঘুম নেই। স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি গালে হাত দিয়ে বসা। মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে চিন্তার পোকা। জ্ঞাতি বন্ধুদের কাছে কী করে মুখ দেখাবে তারা!

কানুর সঙ্গে তারপর আর কথা হয় নি। বিকেল থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে। একটু বেশী রাত্রে চুপিচুপি বাড়িতে ঢুকে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়েছে, না মটকা মেরে আছে, তাই বা কে জানে! নন্দ কয়েকবার চেষ্টা করেছে ছেলেকে ডেকে তুলে একটু শাসন করতে। বাধা দিয়েছে যশোমতী। স্বামীর হাত চেপে ধরে মিনতি করে বলেছে, ওগো না, তাতে যদি আমাদের সর্বনাশ হয়ে যায়? কটু কথা বললে যদি একেবারেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সে। তখন যে দশদিক আঁধার হয়ে যাবে, পৃথিবী শূন্য হয়ে যাবে! কেঁদে কেঁদে তখন অন্ধ হয়ে যাবো না?

নন্দ সে-কথা অস্বীকার করতে পারেনি। জেদী ছেলে, এমনিতে মারলে বকলে কাঁদে না, কিন্তু যদি অপমান বাজে, তাহলে হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে! কিন্তু ওর দুরন্তপনা যেমন দিন দিন বাড়ছে, তাতে একটা কিছু তো করতেই হবে!

এখন কানুর ঘুমন্ত মুখ দেখলে কে ওর ওপর রাগ করতে পারে? ঐ মুখে যেন বিশ্বের মাধুর্যরস মাখানো। কে বিশ্বাস করবে যে ঐ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলভরা মাথাটার মধ্যেই এমন দুষ্টুবুদ্ধি! নিমীলিত চোখ দুটির মধ্যেও কত রূপ। ঠোঁট দু'খানি ঘুমের মধ্যে হাসি-হাসি, এমনই থাকে সব সময়।

ঘুমের ঘোরে কানু পাশ ফিরলো। তার মাথাটা সরে গেল উপাধান থেকে। যশোমতী তাড়াতাড়ি আবার মাথাটা তুলে দিতে গেল। নন্দ কপট ভর্ৎসনায় বললো, যাক্, অত আদর দিতে হবে না! এত আদর দিয়ে দিয়েই তো ছেলের মাথাটি খেয়েছো।

এই সময় একটা ভয়ংকর শব্দ হলো। চমকে উঠলো নন্দ। যশোমতী স্বামীর জানু আঁকড়ে ধরে একইসঙ্গে হেসে কেঁদে বললো, ওগো, মেঘ ডাকছে।

দুজনেই ছুটে এলো বাইরে। চড়াৎ করে আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সন্দেহ কী, কানুর গায়ের রঙের মতন মেঘে ছেয়ে গেছে সারা আকাশ।

নন্দ যশোমতীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো আনন্দাশ্রু। দেবতা সদয় হয়েছেন। দেবতা কক্ষনো ছোট ছেলেদের দোষ ধরেন না। ওরা যে এখনো অবুঝ!

ওরা দুজন ঘরের দাওয়ায় বসে রইলো আকাশের পানে মুখ তুলে। হাত দুটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে উঁচু করা। খানিকক্ষণ পরে যখন বৃষ্টি নামলো, তখনই ঘুম নেমে এলো ওদের চোখে। বহুদিন পর ওরা পরম শান্তিতে ঘুমোলো।

এর কয়েকদিন পর কানু আর একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করলো।

দু-তিন দিন ধরে বলরামের অসুখ। বলরাম খুবই গুরুভোজী বলে প্রায়ই তার পেটের পীড়া হয়। কদিন সে আর গোষ্ঠে যায় নি। সে না থাকলে অনেক খেলা জমে না।

সেদিন সকালবেলা রাখাল ছেলেরা কানুকে ডাকতে এসেছে, কানু বললো, না রে ভাই আজ আর আমি যাবো না। আজ আমি বলাই দাদার কাছে থাকবো।

ছেলেরা অনেক কাকুতিমিনতি, অনেক অনুনয়বিনয় করলো, কানু টললো না। তা দেখে খুব খুশী হলো যশোমতী। ছেলের তাহলে এক টুভবিজ্ঞান হয়েছে। যে বলাই তাকে অত ভালোবাসে, তার অসুখের সময় কি কানুর খেলতে যাওয়া ভালো দেখায়!

একা অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রোহিণী বিপন্না বোধ করবেন বলে যশোমতী রোজই সেখানে যায় বলাইয়ের শুশ্রূষা করার জন্য। সেদিন কানুকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

পীড়িত অবস্থাতেও বলরাম শয্যায় শুয়ে শুয়ে এক বৃহৎ ভাণ্ড ভর্তি দুধ-চিঁড়ে-কলা সাপটাচ্ছে। কানুকে দেখে সে যথার্থ খুশী হলো। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললো, মা, কানুকেও আমার মতন খাবার দাও।

রোহিণী ইতিমধ্যে আরও কৃশ হয়েছেন। মাথার চুলে আরও জট পড়েছে। চোখ দুটি আরও জ্বলজ্বলে। তাকে দেখলেই যশোমতীর একটু একটু ভয় করে।

ছেলের অসুখের জন্য রোহিণী একটুও চিন্তিত নন। তিনি কানুকেই দেখতে লাগলেন ভালো করে। তাকে কাছে ডেকে মস্তকের ঘ্রাণ নিলেন, তার চিবুকে, বাহুতে নিজের হাত বুলোলেন। বললেন, বাঃ এ তো বেশ বড় হয়ে গেছে, রীতিমতন শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষ।

কানু লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলো। বলরাম বললো, জানো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় কানুর সঙ্গে এখন কেউ পারে না! রোহিণী

বললেন, শুধু খেলায় কেন, আসল যুদ্ধেও কানুর সঙ্গে কেও পারবে না। ওকে অনেক বড় যুদ্ধ করতে হবে! তাই না কানু?

যশোমতীকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে রোহিণী কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বোন যশোদা, এবার তৈরি হও, কানু আর তোমার কাছে বেশী দিন থাকবে না।

এ কী অলুক্ষুণে কথা! শুনলেই বুক কাঁপে। যশোমতীর মুখ রক্তহীন হয়ে গেল। খুব অস্ফুটভাবে বললো, এ কথা কেন বলছো, দিদি?

রোহিণী যশোমতীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুঝি আরও কোনো কঠোর কথা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন। যেন তাঁর মায়া হলো। কণ্ঠস্বর নরম করে বললেন, এসব ছেলে বেশী দিন ঘরে থাকে না।

যশোমতী বললো, কানু আমাকে ছেড়ে কোনোদিন কোথাও যাবে না। সে সে-রকম ছেলেই নয়!

রোহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আগে থেকে মন শক্ত করে রাখাই ভালো। নইলে পরে বেশী কষ্ট পেতে হয়!

যশোমতীর আর থাকতে ভালো লাগলো না সেখানে। রোহিণীকে আজকাল সে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। খানিকটা পরেই সে কানুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু দিনের বেলা একা একা বাড়িতে কানুর মন টিঁকবে কেন? সে বললো, মা, এখন তাহলে গোষ্ঠে যাই?

যশোমতীর ডান চোখের পাতা কাঁপছে। কী যেন এক অজানা আশঙ্কা তাকে ঘিরে আছে আজ। সে বললো, থাক না, আজ আর না গেলি। আজ তুই আমার কাছে থাক, কানু!

কানু বললো, যাই না, একবার ঘুরে আসি! এই তো যাবো আর আসবো!

লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল সে। আভীরপল্লীর পাশ দিয়ে, আখের ক্ষেত পেরিয়ে, বনপথ ধরে সে পৌঁছে গেল যমুনার তীরে গোষ্ঠভূমিতে। সেখানে গিয়ে সে চমকে গেল।

রাখালেরা কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কেউ গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে, কারুর মুখে কথাটি নেই। কেউ বড় বড় শ্বাস ফেলছে, কারুর চোখে জল।

এ কী হয়েছে ? এ কী হলো ?

একজন বললো, হায় কানু, তুই ছিলি না। আজ আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে !

কী হয়েছে ? কিসের সর্বনাশ !

আমাদের শ্যামলী আর নেই !

গোষ্ঠের পালের মধ্যে শ্যামলী গাভীটি সবচেয়ে সুলক্ষণা। তার নরম গা থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ে, তার দীঘল চোখ দুটি যেন দীঘির জলে ভরা। সুবলের বড় প্রিয় ধেনু।

অন্যদিন কানুর বাঁশির সুর শুনে গোরুগুলি সব এক জায়গায় থাকে। আজ কানু নেই, আজ খেলা জমে নি, আজ রাখালদের গোচারণেও মন ছিল না। গোরুগুলি ছিটকে গেছে এদিক ওদিক। হতভাগিনী শ্যামলীর এমনই কুগ্রহ হলো আজ, এতবড় যমুনা নদী থাকতেও সে কিনা চলে গেল কালীয়দহের দিকে। সুবল শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পিছু পিছু, তবু আটকাতে পারলো না। জলে মুখ দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীকে টেনে নিয়ে গেল সেই অজগর সাপটা !

কানু বিস্ফারিত চোখে বললো, অত বড় ধেনুটাকে সাপে নিয়ে গেল ?

মধুমঙ্গল বললো, তুই জানিস না কানু সেই মহা অজগর কী প্রকাণ্ড ! তার দেহটা বটগাছের গুঁড়ির মতন, তার দাঁতগুলো কোদালের মতন, তার চোখ দুটো মশালের মতন, তার ফণাটা নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী দৈত্য। তুই শুনিস নি, দৈত্যরা জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে !

কালীয়দহের সাপটার কথা কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। দহের জল নাকি বিষ হয়ে গেছে। কেউ ওর ধারে কাছে যায় না। বনের পশুপাখিরাও ঐ জল পান করে না, আর শ্যামলীই কিনা মরতে গেল ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানু জিজ্ঞেস করলো, সুবল কোথায় ?

রাখালরা উত্তর দিল, সেই তো হয়েছে আর এক বিপদ। সুবল সেই কালীয়দহের পারে বসে অবিরল চক্ষের জল ফেলছে। শ্যামলী যে ছিল তার প্রাণের পুত্তলি। সুবলকে ফিরিয়ে আনার

অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে কিছুতেই আসবে না। অন্য রাখালরা ভয়ে সেখানে থাকতে পারে নি।

গায়ের উত্তরীয়টা খুলে কোমরে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে কানু শান্তভাবে বললো, আজ আমি ঐ সাপটাকে মারবো।

কানু সত্যি সত্যি কালীয়দহের দিকে এগোচ্ছে দেখে সব রাখালরা ঘিরে ধরলো তাকে। সবাই সমস্বরে বললো, এ রকম পাগলামি করিস নে কানু! এ তো সাপ নয়, এতো দৈত্য! মানুষ কখনো পারে এর সঙ্গে!

কানু বললো, ছাড়, আমি যাবোই!

অংশুমান বললো, তোকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এতো শুধু গায়ের জোরের ব্যাপার নয়, একটু বিষের ছোঁয়াতেই যে মানুষ শেষ হয়ে যায়।

কানু বললো, আমি এক সাধুর কাছে শুনেছি, জলজ সাপের দাঁতে বিষ থাকে না!

সুদাম বললো, তা হলে দাঁড়া। আমরা ঘোষপল্লীর বয়স্কদেরও খবর দিই, সবাই মিলে এক সঙ্গে যদি—

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কানু বললো, আমি রাজা না? কোনো বিপদ-আপদ হলে আমাকেই আগে যেতে হবে।

কানু তীরের মত ছুটছে। তার ছিপছিপে শরীরটা বাতাস কেটে সাঁ করে বেরিয়ে যায়। অন্য রাখালরা বুঝলো তাকে এখন আটকাতে যাওয়া বৃথা। কানু কালীয়দহের কাছে পৌঁছে দেখলো, সুবল হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। দহের জল নিস্তরঙ্গ, সেখানকার বাতাসও কেমন যেন থমথমে।

কানু এসে সুবলের ঘাড় ধরে হেঁচড়ে টেনে আনলো অনেকখানি। ধমক দিয়ে বললো, জলের এত কাছে বসে আছিস কেন! সুবল ঝরঝরিয়ে কেঁদে বললো, কানু আমার শ্যামলী নেই, আমি আর বাড়ি যাবো না! কানু ধমক দিয়ে বললো, আগে তাকে আটকাতে পারিস নি কেন? এখন কেঁদে কী হবে? এখন প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি, তুই দ্যাখ্।

তারপর তার বাঁশিটা সুবলের হাতে জমা দিয়ে সে তার কাপড়ে মল্লসাঁট বাঁধলো। জলের কিনার ঘেঁষে রয়েছে একটা

বড় কদম গাছ, কানু তরতর করে উঠে গেল সেই গাছে। একেবারে মগডালে উঠে সেখান থেকে লাফ মেরে গিয়ে পড়লো দহের মাঝখানে।

এদিকে ভয়-তাড়িত রাখালরা ছুটে গেছে আভীরপল্লীতে। সেখানে ক্ষ্যাপার মতন তারা আকণ্ঠ চিৎকার করতে লাগলো ওগো, সর্বনাশ হয়েছে! কে কোথায় আছো, শিগগির এসো! কানু কালীয়দহে ঝাঁপ দিয়েছে!

যে-সমস্ত পুরুষরা গ্রামান্তরে যায় নি, তারা সবাই এলো ঘরের বাইরে। নারীরাও বেরিয়ে এলো। সকলে মিলে ছুটলো দহের দিকে। কালীয়দহের চার পাশ একেবারে ভিড়ে ভেঙে পড়লো। হাট থেকে ফিরছিল গোপিনীরা, তারাও চিৎকার শুনে ছুটে এলো।

বেশ কিছুক্ষণ দহের জল একেবারে শান্ত। কানু কোথায় তলিয়ে গেছে। তার আর চিহ্ন নেই। সকলে হাহাকার শুরু করেছে। কানুর মা যশোমতী এখনো খবর পায় নি, সে যাতে এদিকে না আসে তাই দু-একজন ছুটে গেল তাকে সামলাতে।

এক সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দহের ঠিক মাঝ অংশে ছিটকে ওপরে উঠে এলো কানু! তারপর দেখা গেল সেই অজগরের মাথা। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা মেলে সেটা গ্রাস করতে এলো কানুকে, কানু ডুব দিয়ে উলেটা দিকে এসে দুহাতে চেপে ধরলো তার ফণা। প্রচণ্ড লড়াইয়ে সমস্ত দহের জল উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

গোয়ালারা যে যা পেরেছে লাঠি, বল্লম, রামদা এনেছে সঙ্গে, কিন্তু এখন কানু আর অজগরটা এমন অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে যে দূর থেকে কোন সাহায্য করার উপায় নেই। তারা দর্শক হয়েই রইলো।

প্রায় অড়াই দণ্ড ধরে চললো সেই যুদ্ধ। তারপর কালীয়দহের কালো জলে দেখা গেল সরু সরু রক্তের রেখা। কানুরই গায়ের রক্ত। সাপটা তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। সাপের গায়ে রক্ত থাকে না! কানু শেষ বারের মতন মুচড়ে দিয়েছে অজগরের ফণা।

রক্তাক্ত শরীর নিয়ে কানু উঠে এলো ওপরে। কে তাকে আগে ছোঁবে, কে তাকে আগে শুশ্রূষা করবে, তাই নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। আজ কানুর সমস্ত দোষ মুছে গেছে। আজ সে বৃন্দাবনের সকলের চোখের মণি।

এতখানি বীরত্ব এই অঞ্চলে কেউ কখনো দেখায় নি। কানু আজ দেখিয়ে দিয়েছে, যে-কোন ভয়কেই জয় করা যায়।

সেই ভিড়ের মধ্যে কানু বিশেষ করে দেখলো একটি নারীকে। তার রূপ আর সকলকে ছাপিয়ে, এই পৃথিবী ছাপিয়ে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। পিঠের ওপর ঢাল হয়ে আছে এক রাশ চুল। ভ্রমর কালো চোখের ওপরে বড় বড় পল্লব। তার গ্রীবা যেন নদীর একটি তরঙ্গ।

সেই রমণী তার কাছে আসে নি। তবু দূর থেকে তার দৃষ্টিতে যেন ঝরে পড়ছে মুগ্ধতার আলো। শুধু সেই একজনের দৃষ্টিতেই কানুর সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

কানুর মনে হলো, সে যে জীবন তুচ্ছ করে ঐ সাপটার সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল, তা ঐ একজনের দৃষ্টির জন্যেই সার্থক হয়ে গেল। অতখানি সুধা মানুষের দৃষ্টিতে থাকে? কানু সেই রমণীকে আরও কাছ থেকে দেখতে চাইলো, শুনতে চাইলো তার মুখের একটি কথা। কিন্তু পারলো না। ভিড়ের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ এসে লেগেছে। রাখাল বালকরা জোর করে কানুকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কানু ঘাড় ঘুরিয়েও আর দেখতে পেল না সেই নারীকে।

কানু তাকে চিনতে পারলো না। অনেকদিন দেখেনি তো। সেই রমণীর নাম রাধা।

—সেদিন একজনকে দেখলাম ··

—কে ?

—আমার মন ভালো নেই, সুবল। আজ আমার খেলায় যেতে ইচ্ছে করে না। আজ আমার বাঁশি বাজাতে ইচ্ছে করে না। আজ আমি গোচরণে যাবো না।

—তোর কী হয়েছে কানু।

—আমি জানি না। আমার শরীরে জোর নেই, চোখে সুখ নেই। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না, সুবল। কেউ কথা বললে বাতাস কাঁপে, তা এসে আমার গায়ে ঝাপটা মারে।

—অমন করিস নি, কানু। তোর কী অসুখ হলো ? তুই বুঝিস না, তোর কষ্ট হলে আমাদেরও কষ্ট হয়। তোর হাসিমুখ না দেখলে আমরা ত্রিভুবনে আমোদ পাই না। ধেনুদের গলার টুং-টাং শব্দ শুনে তোর মন উচাটন হচ্ছে না ? কদম্ব গাছের নীচে তোর সব খেলার সাথীরা বসে আছে, তাদের কাছে যাবার জন্য তোর মন অস্থির করছে না ? আজ আমরা আবার রাজা-প্রজা খেলবো। তুই না গেলে কে রাজা সাজবে ?

—ওসব ছেলেখেলা আর আমার ভালো লাগে না, সুবল। আমি শুধু তাকে দেখতে চাই, তার কাছে যেতে চাই, তার দুটো কথা শুনতে চাই। কোনো দিন কি আমি তার পায়ে আমার মাথা রাখতে পারবো ? কোনোদিন কি সে সহাস্যে তার কোমল হাতে আমার এই রুক্ষ চিবুক একবার স্পর্শ করবে ? কোনো-দিন কি তাকে আমি সত্যি দেখেছি, না কি সে স্বপ্ন কিংবা মায়া ?

—সে কে ? তুই কার কথা বলছিস, কানু ?

—তাকে দেখিস নি ? তার মাথার চুলে ছিল সিঁদুরের টিপ, যেন সজল মেঘে নতুন সূর্য উঠেছে। সোনার পদ্মের মতন তার মুখ, তাই দেখেই যেন চাঁদ লজ্জা পেয়ে দু' লক্ষ যোজন দূরের আকাশে চলে গেছে। তার কাজলটানা চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল

অথচ যেন আলস্যমাখা। তার কোমর খুব সরু কিন্তু গুরুভার নিতম্বদেশ। সে রাজ-হংসীর মতন ছন্দোময় ধীরভাবে হাঁটে···

—কিন্তু তাকে দিয়ে কী হবে ?

—সে আমার সব। আমার গোটা হৃদয়টাই এখন আমার চোখে এসে ভর করেছে। আমার চোখ দিয়ে আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই।

—কী জানি, কার কথা বলছিস তুই। গোপপল্লীতে তো সুন্দরীর অভাব নেই।

—ওসব বলিস না, সুবল! তার মতন আর কেউ নয়। শুধু চোখের দেখায় আর কে আমাকে এমন অবশ করে দিতে পারে? সুবল, আমি আর একটিবার তার কাছে যাবো, আর একবার তার মুখের হাসি দেখবো।

—দেখবি, দেখবি। এই অঞ্চলেরই মেয়ে যখন, তখন আবার ঠিকই দেখতে পাবি। এখন চল, গোচারণে যাই।

—নাঃ।

কানু সুবলের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সুবল খানিকটা অনুসরণ করেও নিবৃত্ত হলো শেষ পর্যন্ত। কানু ইচ্ছে করে ধরা না দিলে তাকে ধরার সাধ্য নেই সুবলের।

গোচারণ থেকে অনেকখানি দূরে, যমুনায় খেয়া পারা-পারের ঘাটে এসে বসে রইলো কানু। নদী এখন বেশ চওড়া, ওপারের গাছপালা খুদে খুদে দেখা যায়। ওপারে মস্ত বড় গঞ্জের হাট, এপার থেকে গোপবালারা ঐ হাটে যায় বিকিকিনি করতে। তাছাড়াও সাধারণ মানুষের পারা-পার লেগেই আছে। এক নির্বিকার নিঃশব্দ বুড়ো মাঝি সারাদিন খেয়া বেয়ে যায়।

জলে পা ডুবিয়ে কানু সেই নদীর ধারে বসে রইলো, বসেই রইলো। মাথার ওপরে চড়া হয়ে এসেছে রোদ, তার হুঁশ নেই। একবারও নড়ে না চড়ে না। শরীরের ব্যথা-বেদনার বোধটুক পর্যন্ত যেন চলে গেছে তার। জলের ওপরে রৌদ্রর স্রোত, আকাশে ঘুরে ঘুরে ডাকছে গাংচিল।

এক সময় কানুর শরীর চঞ্চল হয়ে উঠলো। মুখ-মন্ডলে দেখা দিল স্বেদ, চক্ষে ব্যাকুলতা। ব্রজাঙ্গনারা ওপার থেকে এপারে

আসছে খেয়ার নৌকায়। ষোলো-সতেরোটি মেয়ে, তাদের মাঝখানে রাধা। রাধাই যেন চাঁদ, অন্য মেয়েরা তার আভা।

ঘাটে নেমে মেয়েরা কলগুঞ্জন করতে করতে উঠে গেল ওপরে। কানু নড়লো না জায়গা ছেড়ে। রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে ভর করেছে। সে যে উঠে গিয়ে রাধার সঙ্গে একটিবার কথা বলবে, সে সাহস নেই।

কানু নির্নিমেষে দেখছে। এই চোখের দেখাই যেন জীবনের সর্বস্ব। রাধার শরীরের প্রতিটি রেখার নামই যেন মায়া। সে এত সুন্দর যে কষ্ট হয়। কানুর হাতে এক আঁজলা জল, যেন সে রাধার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিচ্ছে।

পথটিকে ধন্য করে, পায়ের স্পর্শে যেন পদ্মফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে রাধা যখন সখীদের সঙ্গে চলে গেল অনেক দূরে, তখন কানুর বুক ভেঙে গেল। রাধা একটিবার তাকালো না তার দিকে? সে যে একটা মানুষ বসে আছে ঘাটের পাশে, সেদিকে কি একবারও চোখ ফেলতে নেই? কানুর ইচ্ছে হলো, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে একেবারে অতলে তলিয়ে যেতে। তার আর বেঁচে থেকে লাভ কী? একটিবার, শুধু একটিবার যদি সে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতো ··

পরদিন কানু গেল স্নানের ঘাটে। গোপবালারা সবাই এখানে স্নান করতে আসে, রাধাও নিশ্চয়ই আসবে। কানু চুপি চুপি গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলো একটা ঝোপের আড়ালে। কিন্তু একটু পরেই তার মনে হলো, তাকে এখানে বসে থাকতে দেখলে গোপিনীরা নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে কিংবা রাগ করবে। তাতে তো লাভ নেই। সে যে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর মতন রাধার মুখের হাসিটাই দেখতে চায়। তার চেয়ে বনপথ দিয়ে যখন গোপিনীরা আসবে, সে যদি উল্টাদিক দিয়ে সেদিকেই হেঁটে যায়! তাহলে এক সময় তার মুখোমুখি পড়তেই হবে। তখন রাধা কি একবার চাইবে না তার দিকে? শুধু একটিবার, এক লহমার জন্য? কালীয়দহের তীরে রাধা যে দৃষ্টিতে ভুবন আলো করেছিল, কানু সেটা আর পাবে না কখনো?

একসময় দূরের বনপথ সুরলহরীতে ভরিয়ে দিয়ে আসতে লাগলো গোপিনীরা। তারা রঙ্গ করে গাইছে মানভঞ্জনের গান, চলার তালে

তালে ঝুম ঝুম করে বাজছে তাদের কোমরের গোঠ আর চন্দ্রহার আর পায়ের মল। ওরা কখনো একা আসে না, দল বেঁধে আসে। রাধাকে কখনো কানু একা পাবে না।

কানু যখন ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, দু'একজন গোপিনী তেরছাচোখে দেখলো তাকে। কেউ কোন কথা বললো না। রাধা অবনতমুখী, গানের সুর মেলাতে মেলাতে চলে গেল, একবারও সে দেখলো না কানুকে। একটু দূরে গিয়ে সব মেয়েরা মিলে একসঙ্গে হেসে উঠলো। কানু পেছন ফিরে দেখলো, হাসতে হাসতে গোপিনীরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। কী এমন হাসির কথা তাদের মনে পড়েছে, কে জানে!

কানুর ইচ্ছে হলো, কাছাকাছি কোন লম্বা গাছে উঠে উড়ুনিটা দিয়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলে পড়ে! কিংবা কোনো মৌচাকে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, যাতে লক্ষ লক্ষ মৌচাছি তার গায়ে বিষের হুল ফুটিয়ে দিতে পারে। এমনিতেই তো তার শরীরে বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে।

কানু বনের অনেক ভিতরে ছুটে গিয়ে, নির্জনে, একটা তমাল-গাছের নীচে মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে দারুণ চাপা কষ্টের শব্দ বেরিয়ে এলো, আঃ আঃ—

দু'তিনদিন বাদে সুবল নদীর ধারে কানুকে খুঁজে বার করলো। ঝাঁঝালো গলায় বললো, এরকম করলে তো আর চলে না রে কানু! তোর বিহনে আমাদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কারুর আর কোনো কাজকম্মে মন নেই। বলাইদাদা সব সময় জিজ্ঞেস করেন, কানু কোথায়! তুই বাড়িতে থাকিস না, গোষ্ঠে আসিস না... তুই কি পাগল হলি?

কানু মুখ গোঁজ করে উত্তর দিল, আমার কিছু ভালো লাগে না!

সুবল তবু কানুর হাত ধরে টেনে তুলে বললো, চল্ তো, কোন্ ভুবনমোহিনী তোকে এমন পাগল করেছে, তাকে একবার দেখি গিয়ে! চল্—

কানু যাবে না, তবু সুবল জোর করতে লাগলো। সে কানুর তুলনায় অনেক চটপট মুখে চোখে কথা বলে। সে শুধু গোপিনীদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না, তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারবে।

গোপবালারা পসরা নিয়ে হাটে চলেছে, কানুকে সঙ্গে নিয়ে সুবল তাদের পিছু নিল। আকাশ হালকা মেঘে ছাওয়া, তার আড়াল থেকে সূর্য যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে দিব্যজ্যোতি। সুপবন সর্বাঙ্গে মধুর স্পর্শ দেয়। দিগন্তকে ভাস্বর করে গোপবালারা গান গাইতে গাইতে যায় নদীর দিকে। তাদের হাতে সোনার কঙ্কণ, তাদের মাথায় পিতলের হাঁড়ি-কলসীগুলিও সোনার মতন ঝকঝকে। কেউ কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে নিয়েছে, তাদের শাড়ি গাছ কোমর করে বাঁধা। রাধা সব সময় থাকে গোপবালাদের মাঝখানে।

রাজনন্দনী রাধা আয়ানঘরণী হয়ে সংসারের সব কাজ শিখে নিয়েছে। অন্যান্য গোপাঙ্গনাদের মত সে-ও পসারিণী হয়ে হাটে যায়। গোপপল্লীর রীতি এই যে পুরুষরা করে উৎপাদন, মেয়েরা করে বাণিজ্য। মেয়েদের হাতে সওদা দিয়ে হাটে পাঠানোর বিশেষ সুবিধে এই যে, ক্রয়ার্থী পুরুষরা তাদের সঙ্গে বেশী দরাদরি করে না। তারা চেষ্টা করলেও দরাদরিতে মেয়েদের সঙ্গে পারবে কেন?

গোপবালাদের পিছু পিছু আসতে আসতে সুবল জিজ্ঞেস করলো, ওগো, তোমরা বুঝি হাটে যাচ্ছো?

সঙ্গে সঙ্গে এক গোপিনী উত্তর দিল, কেন, চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছো না?

মুখ ঝামটা খেয়ে কানু তাড়াতাড়ি সুবলের পিছনে লুকোলো। সুবল কিন্তু দমলো না। সে আবার হাসিমুখে বললো, না, তাই ভাবলাম, আমরাও হাটে যাচ্ছি তো, একসঙ্গে যাই!

এক গোপিনী বললো, তার তো কোন দরকার নেই বাপু! আমরা রোজ যেমন নিজেরা নিজেরা যাই আজও তাই যাবো! তোমরা পথ দেখো!

সুবল বললো, একটাই তো পথ, যদি, একসঙ্গে যাই তাতে ক্ষতি কী?

রাধার সখী বৃন্দা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বললো, বলি, তোমাদের মতলবখানা কী শুনি?

ব্রজ-বৃন্দাবনের পথে বিশেষ রিপুভয় নেই। কিন্তু যুবকদের দৌরাত্ম্য কোথায় না থাকে! গোপিনীরা ভাবলো, এই দু'জন এসেছে ছলে-কৌশলে কিছু ক্ষীর-ননী চুরি করতে।

সুবল বললো, মতলব কিছু নেই, আমরা তোমাদের ভার বয়ে দেবো ? তোমাদের কষ্ট হচ্ছে—

কানু বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তোমাদের ভার বয়ে দিতে চাই।

সুবল বললো, আহা, তোমাদের কোমল শরীর, অত নরম হাত, তাতে কি আর এত ভার বওয়া যায় ?

গোপিনীরা কলকল করে হেসে উঠলো।

বৃন্দা বললো, মরণ! ছোঁড়াদের রস দেখো না! বলে কিনা কোমল শরীর! রোজ রোজ বুঝি এই ভার অন্য লোকে বইছে!

বিশাখা বললো, অত যদি ভার বইবার সাধ, তাহলে হাটে গিয়ে মোট বইগে যা না! তাতে দুটো পয়সা পাবি!

সুবল বললো, আমরা তো পয়সা চাই না! আমরা চাই তোমাদের সঙ্গে একটু ভাব করতে। তোমারা আমাদের পানে চেয়ে একটু হাসবে দুটো কথা বলবে—

বৃন্দা বললো, যা যা ছোঁড়া! নিজের কাজে যা! ঢং দেখে আর বাঁচিনে!

গোপিনীদের তাড়নায় এক একবার সুবল আর কানু পেছিয়ে পড়ে আবার একটু পরেই কাছাকাছি গিয়ে ঘুর-ঘুর করে। সুবল তার কাকুতি-মিনতির ভাষা নরম থেকে নরমতর করে আনে, তবু গোপিনীদের মন গলে না।

শুধু কথায় হয় না দেখে সুবল জোর করে কোনো গোপিনীর হাত থেকে পসরা নিজে নিতে গেল। অমনি সেই গোপিনী ফোঁস করে উঠে বললো, এই গায়ে হাত ছোঁয়াচ্ছিস যে! বড় বাড় বেড়েছে না ? এক্ষুনি ফিরে গিয়ে বাড়ির কর্তাদের বলে দেবো!

কানু ততক্ষণে রাধার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাধার হাত থেকে পসরা কেড়ে নিয়ে বললো, এটা আমি মাথায় করে বইছি। এত ভার তোমাকে মানায় না!

কালীয়দহের পাড়ে রাধার মুখে সেদিন যে মুগ্ধতা ছিল, আজ তা একটুও নেই। রাধা কাতরভাবে বললো, কেন তোমরা আমাদের বিরক্ত করতে এসেছো ? আমরা রোজ এই পথ দিয়ে বিকিকিনি করতে যাই—

কানুর বুক ফেটে গেল। রাধার হাসিমুখ সে দেখতে চেয়েছিল,

তার বদলে দেখলো বিরক্তি। রাধা প্রথম তাকে যে-কথা বললো, সেটা ভৎর্সনা!

তবু সে অনুনয় করে বললো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

রাধা বললো, না!

ততক্ষণে সব গোপিনীরা ওদের দু'জনকে ঘিরে ধরেছে। কয়েক-জনের ভান্ড থেকে ক্ষীর-ননী চলকে মাটিতে পড়ে গেছে বলে তারা রেগে আগুন। সবাই ওদের এমন বকুনি দিতে লাগলো যেন তাতে একটা ঝড় উঠে গেল। ওরা আর পালাতে পথ পায় না। দুজনেই পিছু হঠে গেল অনেকটা। গোপিনীরা দ্রুত চলে গেল নদীর পারে।

সুবলের বুক পিঠ ছানার জলে ভিজে গেছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বললো, না রে, কানু এখানে সুবিধা হবে না। গোপিনীদের দেখতে যত নরম, আসলে তা নয়। এক একটি যেন আগুনের মালসা। তুই যার কথা বলছিলি তার সঙ্গে তুই ভাব করবি কী করে? তুই কি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাস? ও যে বৃষভানু রাজার মেয়ে, আয়ান ঘোষের ঘরণী—তুই সামান্য বৃন্দাবনের রাখাল—

কানুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। সে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। আস্তে আস্তে বললো, আমি সামান্য রাখাল হই আর যাই হই, আমি ইচ্ছে করলে ব্রজ-বৃন্দাবন তছনছ করে দিতে পারি!

সুবল বললো, কানু মাথা ঠান্ডা কর।

কানু তবু বললো, আমি সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেবো!

সুবল তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, ওরে কানু, এত মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। তুই গায়ের জোরে কালীয়দহের অজগর সাপ মারতে পারিস, কিন্তু গায়ের জোরে তো আর রমণীর মন জয় করা যায় না। এ বড় কঠিন জিনিস।

কানু তখনও দূরের খেয়াঘাটের দিকে চেয়ে আছে। ততক্ষণে নৌকোয় উঠে পড়েছে গোপিনীরা। তাদের রঙীন আঁচল উড়ছে বাতাসে। তাদের মুখগুলি যেন পারিজাত ফুলের মতন। এতদূর থেকেও সৌরভ পাওয়া যায়।

স্রোতে দুলতে দুলতে নৌকোটি চলে গেল অনেক দূরে।

পরদিন ভোরবেলা কানু কারুকে কিছু না বলে চলে গেল নদী পার হয়ে। হাটে গিয়ে দু'একটা জিনিসপত্র কিনে সে একটু সাজগোজ করলো। তারপর, বনের ধার ঘেঁষে, যেখানে খুব নির্জন, সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে রইলো গ্যাঁট হয়ে।

হাটের মানুষরা পথ দিয়ে যায়, আর কানুকে দেখে ফিরে ফিরে। কেউ তাকে চিনতে পারে না। তার মাথায় পাগড়ি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা, কোমরে জরির কোমরবন্ধ্। ঠোঁটের ওপর বেশ পুরুষ্টু একটা নকল গোঁপ লাগিয়েছে। হাতে একটা বিরাট ধারালো বর্শা। কানুর লোহার দরজার মতন বুক, শালপ্রাংশু বাহু, ঐরকম অপরূপ বেশে তাকে দেখে একটু ভয় করে!

এই পথেরই এক প্রান্তে গঞ্জের হাট, বহুকালের পুরনো। আশে-পাশের অনেক গ্রাম থেকেই মানুষজন আসে। সারাদিন ধরে কেনাবেচা হয়। গ্রামের লোকের যা দরকার, তা এখানেই মেলে। আরও খানিকটা দূরে মথুরা নগরী। সে খুব জমজমে জায়গা। সেখানকার পথঘাটও নাকি কঠিন বাঁধানো। বাড়ির গায়ে বাড়ি। কথায় কথায় সেপাই-শান্ত্রী এসে ধমকে দেয়। গাঁয়ের লোক চট করে সেখানে যেতে সাহস করে না।

যথাসময়ে ব্রজের গোপিনীরা হাটে সওদা করার জন্য এলো এ-পথ দিয়ে। তাদের দেখে কানু একটু নড়েচড়ে বসলো। ওরা কাছাকাছি আসতেই সে উঠে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বললো, এ সুন্দরি! সুন সুন! মো নাম হৃষীকেশ। মো-কে পুছ্ না করে চলে জাচ্ছিস যে?

গোপিনীরা থমকে দাঁড়ালো। একজন তার চিবুকে এক আঙুল ঠেকিয়ে, ভুরু তুলে বললো, ওমা! এ আবার কে? এই যমদূতটা আবার এখানে এলো কোথা থেকে?

কানু জলদগম্ভীর স্বরে বললো, মোকে চিন্‌হো না? আমি মহাদানী। মো তুম্‌হারা সকলের পসরা দেখ্‌।

এক গোপিনী মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, মরণ! তোমাকে কেন আমাদের পসরা দেখাতে যাবো হে?

কানু কোমরে গোঁজা একটা লাল মলাটের খেরো পাতা বার করে বললো, এই দেখো পাঞ্জী। মাহাদানীকে শুল্ক দিতে হয় জানো না?

—এতদিন ধরে এই পথে যাচ্ছি-আসছি, কোনোদিন তো বাপু এমন কথা শুনি নি?

—আগে না শুনেছো তো এখন শোনো।

গোপিনীরা এ ওর মুখের দিকে তাকালো। হবেও বা নতুন নিয়ম। তাছাড়া এড়িয়ে যাওয়া যাবেই বা কি করে? পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রমূর্তি ধরে।

কানাই একে একে তাদের পসরা পরীক্ষা করতে লাগলো। এবং উদারভাবে এক একজনকে ছেড়ে দিয়ে বললো, যাও, তুম্‌হারা কিছু লাগবে না। যাও তোমাকে আজ ছেড়ে দিলুঁ।

সব গোপিনীই মহাদানীর কাছ থেকে ছাড় পেয়ে গেল, পেলো না শুধু রাধা।

কানাই রাধার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললো, এর কাছে তো অনেক জিনিস দেখছি। বহুৎ দামী দামী সওদা। আবার হাতে পায়ে কত গহনা। চুপড়ি নামাও, তোমার সব দেখবো।

অন্য গোপিনীরা একটু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কানু তাদের দিকে ফিরে এক ধমক দিয়ে বললে, যাও! তোমাদের যেতে বলেছি না?

ত্রস্ত পায়ে তারা চলে গেল। সভয়ে বারবার পিছন ফিরে দেখতে দেখতে।

চুপড়ি বাসনপত্র নামিয়ে রাধা আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কানু তাকে ভারিক্কী গলায় জিজ্ঞেস করলো তুমি কে? তোমার ঘর কোথায়? কোন্ দেশে যাবে?

রাধা ক্ষীণভাবে উত্তর দিল, আমার নাম রাধা, গোকুলে থাকি, গোয়ালা জাতি, গোপিনীদের সঙ্গে আমি মথুরা হাটে যাচ্ছি। তুমি এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

—আমি তোমার পসরা দেখবো। তুমি কোন্ কোন্ বস্তু নিয়ে হাটে যাচ্ছো, আমাকে তার বিচার দাও।

—ঘি, দই, দুধ আর ঘোল—এই আমার পসরা। তুমি কোন্ কারণে এর বিচার চাইছো ?

—এর চেয়ে বিস্তর বেশী মূল্যবান পসরা তোমার আছে।

—কী ? আমি তো জানি না।

—তুমি তা জানবে না, অন্যরাই জানবে।

—তুমি কিসের কথা বলছো ?

—তোমার রূপ।

—এ আবার কী রকম কথা ?

—আমি তোমার রূপের জন্য ভিখারী হতে পারি।

—তুমি মশানের ধারে গিয়ে ভিক্ষে করো গে, এই বিকট মূর্তি ধরে এখানে বসে আছো কেন ?

—রাগলে তোমার নীল কমলের মত চক্ষু দুটি কোকনদের (রক্তকমল) মতন দেখায়।

—পথ ছাড়ো। এসব অল্পমতি কথা আমাকে শোনাও, তোমার সাহস কী।

—তাহলে আমার শুল্ক দিয়ে যাও।

—কী তোমার শুল্ক ?

—প্রতি ভাণ্ডে ষোলো পল মহাদান দিয়ে তবে হাটে যাও।

—বিস্তর কালে বিস্তর কথা শুনেছি, কিন্তু এমন বিপরীত কথা কখনো শুনিনি। এতদিন পর মথুরার হাটে হঠাৎ ঘি-দুধের মহাদানী নিযুক্ত হলো ?

—নেকী রাধা, তুমি দেখছি বড়ই আবালী। এই পাঞ্জীর প্রমাণ দেখছো না ? আমি রাজার কাছ থেকে এই পথ জমা নিয়েছি।

রাধা বিরক্তি ও ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে রইলো কানুর দিকে। এত বড় এক সা-জওয়ানকে সরিয়ে সে যাবেই বা কী করে ? হতাশ ভাবে বললো, এত পণ আমি দেবো কোথা থেকে ? আমার কাছে নেই।

কানু সহাস্যে বললো, তোমার অনেক আছে। তোমার কাছে পণের টাকা যদি না থাকে, তুমি জিনিস দিয়ে তা শোধ করো।

—কোন্ জিনিস।

—বললাম তো আগে। রূপ।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতন রাধা মুখ উঁচু করে কানুর চোখে চোখ রাখলো। তারপর বললো, তোমার সাহস তো কম নয়! আমাকে এখানে একা পেয়ে তুমি এমন কথা বলছো! প্রান্তরে সোনার ঘট দেখে চোরের মন সাতপাঁচ করে। তুমি দেখছি সেই চোর!

দু' কোমরে হাত রেখে কানু হা-হা করে হাসতে লাগলো শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে। রাধার ক্রোধ সে বেশ উপভোগ করছে। কৌতুক চঞ্চল চোখে বললো, আমাকে তুমি চোর বলছো? এর উত্তর আমি তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু এখন দেবো না।"

রাধা বললো, মর্কটের হাতে নারকোল পড়লে তার সেটা খাওয়ার জন্য খুব সাধ হয়। কিন্তু ভেঙে খাওয়ার সাধ্য তার নেই। তুমি সেই রকম একটি মর্কট। কিংবা তুমি একটি শিশু, তুমি আগুনকে ফুল ভেবে তাতে হাত দিতে চাইছো।

—অত কথার প্রয়োজন কী? তুমি আমার পণ দিয়ে নিজের মান রক্ষা করো!

রাধা একটি ভাণ্ডের ঢাকনা খুলে বললো, ঠিক আছে, পণের বদলে আমি দ্রব্যই দেবো! আমার দই-মাখনের অংশ দিচ্ছি, তাই নিয়ে তুমি দূর হও!

রাধা তার দ্রব্যসম্ভার ভাগ করতে বসলো। খানিকটা বাদেই সে আবার বললো, কিন্তু তোমাকে আমার পসরার ভাগ দিয়ে দিলে বাড়িতে গিয়ে আমি হিসেব দেবো কী করে?

কানু চট্ করে বললো, এমন দ্রব্যও তোমার কাছে আছে যার কোনো হিসেব দিতে হয় না।

—কী?

—সত্যিই দেখছি তুমি নাবালিকা! কতবার করে বলতে হবে! সেই দ্রব্যের নাম রূপ।

রাধা দর্পিতার মতন উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে বললো, সাপের মাথায় মণি জ্বলে, বলপ্রকাশ করে কে তা নিতে পারে?

তারপর রাধা তার হাঁড়ি-কলসী সব উল্টে দিল। দুধ-দই-ঘি-মাখন সব গড়িয়ে পড়লো পথের ধুলোর ওপর। সমস্ত পসরাই নষ্ট করে দিয়ে রাধা বললো, এবার? এবার তুমি কিসের জন্য পণ চাইবে?

স্তম্ভিত কানুকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে রাধা চলে গেল দৃপ্ত পায়ে।

অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখলো কানু। আর অনুসরণ করলো না। রাধা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে কানু মৃদু হেসে পাশের জঙ্গলে ঢুকলো। আর এক এক করে খুলে ফেললো ছদ্মবেশ। সে-সব সেখানেই পড়ে রইলো।

এক কৌশলে হলো না দেখে কদিন পরে কানু আরেক কৌশল ধরলো।

সেদিন ব্রজাঙ্গনারা হাট থেকে এসেছে খেয়ার ঘাটে। হঠাৎ তারা অবাক হয়ে দেখে, তাদের চিরপরিচিত সেই বুড়ো মাঝি সেখানে নেই। তার নৌকোও নেই। তার বদলে একটা ছোট্ট ভাঙ্গা নৌকো নিয়ে এক কচি চেহারার মাঝি দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশে দলা দলা মেঘ। ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে। বেলা পড়ে এসেছে। এর মধ্যেই একটু ছায়াছায়া ভাব। সকলেরই বাড়ি ফেরার তাড়া।

নবীন মাঝির চুল চুড়ো করে বাঁধা। কপালে ফেট্টি। তাম্বুল রাঙা ঠোঁট, চাদর দিয়ে মুখের অনেকখানি ঢাকা। গোপিনীদের দেখে সে চেঁচিয়ে উঠলো, গেল-গেল-গেল-গেল, কে পারে যাবে জলদি এসো, জলদি জলদি—

গোপিনীরা বললো, এমা! এ আবার কি মাঝির ছিরি! আমাদের সেই মাঝি গেল কোথায়?

নবীন মাঝি বললো, বড় মাঝির উদুরি হয়েছে, সে আজ আর আসবে না। যেতে হয় তো জলদি করো। আমার এক কাহন করে পণ। তা আগে থেকে ক'য়ে দিলাম কিন্তু!

—অ্যাঁ! এই তো ভাঙা নৌকো, তার আবার এক কাহন!

—ভাঙা নাও দেখেছো, কন্নধারের গুণ তো দেখো নি।

এক গোপিনী আর একজনকে বললো, কী জানি বাপু, কেলটে ছোঁড়ার নৌকোয় উঠতে আমার ভয় করছে। শেষে ডুবিয়ে মারবে কিনা কে জানে!

অন্য গোপিনী ব্যঙ্গ করে উত্তর দিলো, এর জন্য কেউ আবার ইচ্ছে করেই ডুবে না মরে! নতুন কর্ণধারের মোহন রূপটি দেখেছিস?

বুড়ো মাঝি ছিল বলেই আমাদের ওনারা এতকাল ভরসা করে ছেড়ে দিয়েছে।

অন্য সখী বললো, আমি কিন্তু অত কালো রং দেখে মজি না, ছুঁলে যেন হাতে কাঁচা রং উঠে আসবে।

আরেকজন বললো, ওরে, তোরা কি গল্প করেই বেলা পার করে দিবি? বাড়ি যেতে হবে না?

—কিন্তু এর নৌকোয় যে বাড়ি ফিরতে পারবো, তার ভরসা কী?

—এ কি সেই বুড়ো মাঝির ছেলে? আগে তো একে দেখি নি।

—কী ঠোঁট-কাটা বাবা! প্রথমেই বলে কিনা এক কাহন পণ! আগে ভালোয় ভালোয় পেঁছে দেবে তবে তো পণ চাইবে।

মাঝি চেঁচিয়ে বললো, যাবে কি যাবে না, সাফ কথা বলে দাও। আমার নাও এখুনি ছাড়বে।

তখন গোপিনীরা দেখলো আর উপায়ান্তর নেই, প্রাণ সংশয় করে এই টুটোফুটো নৌকোতেই যেতে হবে। কখন ঝড়বৃষ্টি নামবে তার ঠিক নেই। সবাই হুড়মুড় করে চলে এলো জলের কাছে।

মাঝি আঁতকে উঠে বললো, আরে, রও রও, রও করো কী, করো কী! সবাই মিলে উঠে কি আমার নাও ডোবাবে নাকি? আমার এ-ভাঙা নাও-এ একবারে একজনের বেশী যায় না।

এই বলে সে টপ্ করে রাধার হাত টেনে ধরে তুলে নিল নৌকোর ওপর। তারপর পায়ের ধাক্কায় নৌকো কূলছাড়া করলো। মুখ থেকে তার সরে গেছে চাদরের ঢাকনা।

তখন তীরের গোপিনীরা সবিস্ময়ে বললো আরে, এ সেই কানু ছোঁড়া না? দেখেছো ছোঁড়ার কাণ্ড? গাল টিপলে দুধ বেরোয় তার এত রস?

কানু ততক্ষণে পাকা মাঝির ভঙ্গিতে মুখ দিয়ে হে-হে লহে লহে লহে লহে লহে শব্দ করে খুব জোরে জোরে বৈঠা চালাচ্ছে। রাধা অবাক হয়ে দেখছে তাকে। কানুর সুঠাম শরীর, বালকের মতন মুখ, দুষ্টুমি ভরা চোখ।

রাধা জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো কানাই! তুমি একি করছো?

কানু বললো, তোমাকে একলা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি!

—ছিঃ, ওকথা বলে না। তুমি এরকম পাগলামি করছো কেন?

—আমি তো পাগলই, কিন্তু তুমিই তার জন্য দায়ী।

ওমা, সে কী কথা? আমি তোমার কী করেছি?

—তুমি আমায় সর্বস্বান্ত করেছো। এখন তুমিই আবার আমায় ধনী করতে পারো।

—আমি সখীদের সঙ্গে হাটের পথে যাই আসি। কোনো দিন তো অন্য কারুর পানে তাকাই নি। তুমি কেন আমায় দোষারোপ করছো? আমি তোমায় সর্বস্বান্ত করবো কেন, পাগলই বা করবো কী করে?

হ্যাঁ, তুমিই আমাকে পাগল করেছো। কালীয়দহের পাড়ে, সেদিন তুমি কেন অমন করে চোখ দিয়ে হেসেছিলে? কেন তোমার এমন ভুবন আলো করা রূপ? তোমার যাওয়া আসার পথের ধারে আমি কত দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি, তুমি ভ্রূক্ষেপও করো নি? যেন আমাকে দেখতেই পাও না। আসলে কিন্তু দেখতে পেতে। একদিন তুমি যমুনার ঘাটে যাচ্ছিলে, আমাকে দেখে কেশবন্ধনের ছলে কেন বাহু তুললে? সে তো আমাকে পাগল করার জন্যই। মুখ মোছার জন্য তুমি যে-ই তোমার বুকের রেশমী আঁচল ঘোচালে, অমনি আমি তোমার কুচভার দেখলাম। তা দেখে আমি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছিলাম। নদীতে জল তোলার সময়, তুমি যেন জলের সঙ্গেই চুপি চুপি মধুরসবাক্য বলছিলে—এসব কি আমাকে পাগল করার জন্য নয়?

রাধা ত্রস্তে বলে উঠলো, না, না, তুমি ভুল বুঝেছো। তুমি প্রায়ই আমাদের পেছনে পেছনে আসতে, সেদিন তোমাকে অত কাছাকাছি দেখে আমি ভয় পেয়ে দ্রুত যেতে গেলাম, সেইজন্য আমার কেশ এলিয়ে গেল। তাই দু'হাত তুলে আমি কেশ সংযত করেছিলাম। বাতাসে আমার বুকের আঁচল খসে গিয়েছিল, দৈবাৎ সেই সময়েই তুমি তাকিয়েছো। আমাকে দেখে যদি তোমার মন বিচলিত হয়, তবে তো আমার বেঁচে থাকাই উচিত নয়। আমি কি তবে আজ থেকে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকবো?

কিন্তু সেই সময় তুমি তোমার চোখ দুটিও তরল করেছিলে।

—চোখ তরল করেছিলাম? সে তো ভয় ও লজ্জায়।

—না।

—নিশ্চয়ই। কানু, তুমি এসব কী বলছো? আমি যমুনার জলের সঙ্গে তো মধুরসপূর্ণ কথা বলতেই পারি, কিন্তু তোমার সঙ্গে তা বলবো কেন? তোমার জন্য এখনো আমি ভয় পাচ্ছি। যাকে আপদে পায়, সে নিজেকে চিনতে পারে না। তুমি মতিচ্ছন্ন-হেতু পাগল হয়েছো!

—তা যদি সত্যও হয়, তবু এখন আমাকে আবার সুস্থ করে তোলার উপায়ও তোমার হাতে।

—কী সে উপায়?

—তোমার আলিঙ্গন।

লজ্জায় রাধার কর্ণমূল ও গালে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়লো। মুখখানি যেন কুঙ্কুম মাখানো স্থলকমল। সে কানুর দিকে আর ভালো করে তাকাতে পারলো না। মুখখানি পাশের দিকে ফিরিয়ে জল দর্শন করতে করতে বললো, আমাকে ওসব কথা বলো না, বলতে নেই।

কানু বললো, তুমি স্নানের ঘাট থেকে ফিরছিলে, আমি দেখেছিলাম সে যেন আমার দিব্যদর্শন। তোমার ভিজে চুল দিয়ে জল ঝরছে, যেন মুখশশীর ভয়ে আঁধার কাঁদছে। মুখের ওপর এসে পড়েছে চুর্ণ অলক, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমর। কুচ যুগল যেন দুটি সুন্দর চক্রবাক—কোন্ দেবতা তাদের এনে মিলিয়েছে—আর পাছে উড়ে না যায় তাই ভুজ পাশে বেঁধে রেখেছে। হাত দুটো যখন একটু সরালে, তখন আবার অন্যরকম মনে হলো—যেন দুটো সোনার বাটি উল্টো করে বসানো। কিংবা ঠিক হলো না। তোমার পয়োধরের ওপর সিক্ত বসন—ঠিক যেন মনে হয় সোনার বেলফলের ওপর হিম পড়েছে। সত্যি এরকম মনে হয়েছিল। তোমার মনে হচ্ছে না, এসব পাগলের প্রলাপ?

রাধা এবার সর্বাঙ্গ বসনে ভালো করে ঢেকে, বাহুতে মুখ লুকিয়ে বললো, কানু, এসব কথা তুমি কোথা থেকে শিখলে? আমাকে এসব বলো না। আমি তোমার থেকে বয়েসে বড়ো। তা ছাড়া সম্পর্কে তোমার আত্মীয়!

কানু ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, ইস্ ভারি তো আত্মীয়! সাতজন্মে দেখা নেই, তার আবার আত্মীয়তা! তুমি আমাদের বাড়িতে কখনো এসেছো?

—কারুর বাড়িতে যাওয়া আমার নিষেধ।

—তবে? আর বয়েসের কথা বলছো? সুন্দরের কোনো বয়েস আছে নাকি?

—আত্মীয়তা যদি না-ও মানো, তবু একথা তো মানবে যে আমি পরের ঘরণী?

হঠাৎ এই কথা বলে রাধা কেঁদে ফেললো। কানু সে কান্নার মানে বুঝতে পারলো না। সে রাধার কম্পিত শরীরের দিকে চেয়ে রইলো।

রাধা আবার বললো, কানু আমার এমনিতেই অনেক কষ্ট। তুমি আর আমাকে কষ্ট দিও না।

কানু বললো, আমার কষ্ট তোমার চেয়ে মোটেও কম নয়। তুমি তা বোঝো না, কারণ তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখো না। সে যাই হোক, তুমি যেখানে ঘরণী আছো, তা থাকো—কিন্তু এখানে তো এটা কারুর ঘর নয়। এখানে মাথার ওপরে আকাশ, চারদিকে কোনো দেয়াল নেই—এখানে আমার মনে হয়, আমিই সবকিছুর অধিপতি। এখানে তুমি আমার।

রাধা বললো, তুমি চোরের মতন আমাকে চুরি করে নিতে চাও। তোমার ছেলেবেলার অনেক দুরন্তপনার কথা শুনেছি—কিন্তু তুমি যে এরকম চোর হয়ে উঠেছো, তা জানতাম না।

কানু মিটিমিটি হেসে বললো, তুমি এর আগেও একদিন আমাকে চোর বলেছিলে—

—কবে আবার বললাম?

—বলেছিলে, তোমার মনে নেই। সেদিন তোমায় উত্তর দিইনি। আজ দিই? আসলে তুমিই চোর।

—আমি?

—নিশ্চয়ই। তুমি, শ্রীমতী রাধা, একটি মস্ত বড় চোর।

—আমি কবে কী চুরি করেছি?

—শুনবে? তুমি রাজকন্যা কিনা, তাই তোমার পক্ষে চুরি করা অনেক সহজ। দেখো, তুমি স্বর্ণের বর্ণ চুরি করে নিজের অঙ্গে লুকিয়ে রেখেছো। চন্দ্রের কিরণ চুরি করে রেখেছো নিজের চন্দ্রাননে। মদনের ধনুকটা চুরি করে রেখে দিয়েছো নিজের ভুরুর মাঝখানে।

বনের হরিণীর কাছ থেকে তুমি হরণ করেছো তার চোখ দুটি। পক্ক বিম্বের শোভা চুরি করে তুমি রেখেছো তোমার ওষ্ঠে। কোকিলের স্বর চুরি করে রেখেছো নিজের কণ্ঠে। সাদা বেগুনের মসৃণতা চুরি করে তুমি রেখেছো তোমার চিবুকে। কোন্ মরালীকে নিঃশেষ করে তৈরি হয়েছে তোমার গ্রীবা। সুমেরু পর্বতকে বঞ্চিত করে শোভিত হয়েছে তোমার কুচযুগ। সিংহের কাছ থেকে চুরি করেছো তার কোমরের খাঁজ। গজের কাছ থেকে চুরি করেছো তার গতি। কদলীকাণ্ডের গড়ন চুরি করে রেখেছো নিজের উরুতে। তম্বুরা বাদ্য হরণ করে রেখেছো তোমার নিতম্বে। পদ্মফুলের কোমলতা রেখেছো তোমার পায়ে। একসঙ্গে এতগুলো চুরি আর কে করতে পারে? এর চেয়েও বড় কথা, তুমি চুরি করেছো আমার চিত্ত। তুমি আবার আমাকে চোর বলো?

আকাশে মেঘ জমাট হয়ে এসেছে। আর রাধার খুব কাছে নৌকার ওপর বসে আছে এক মেঘবর্ণ যুবা। রাধার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠলো। এখুনি বুঝি ঝড় উঠবে, শুরু হবে প্রলয়।

নৌকো রয়েছে মাঝনদীতে। কানুর আর নৌকো বাওয়ার দিকে মন নেই।

রাধা কানুকে কী উত্তর দেবে কিছুতেই ভেবে পেল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে হঠাৎ বলে ফেললো, আমার ভয় করছে।

কানু জল থেকে বৈঠা তুলে ফেললো। বাতাসের বেগ বেড়েছে, স্রোতের ধাক্কায় দুলতে লাগলো নৌকো।

কানু হাসতে হাসতে বললো, আমি তো রয়েছি, ভয় কী! তুমি শুধু আমায় একটিবার আলিঙ্গন দাও!

যেন নিজেকেই বেশী করে শোনানো দরকার, সেই জন্য রাধা জোরে জোরে তিনবার উচ্চরণ করলো, না, না, না!

দুটি আঙুল তুলে, সমান্যতর ভঙ্গি করে কানু বললো, তুমি যদি আমাকে একটুখানি, এই এতটুকুও দয়া করো—

—না, না, না।

—দেখো, এই যে আকাশ, বাতাস, দশদিক—এখন আমার মনে হয় আমিই এইসব কিছুর অধীশ্বর। আমার মনে এই জোর আছে

যে আমি ইচ্ছে করলেই সব কিছু পেতে পারি। সেই আমি, তোমার কাছে দয়া চাইছি। তুমি আমার হও।

—তা হয় না, কানু, তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারবো না—কিন্তু তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না।

কানুর তন্ময় ভাবটা কেটে গেল আবার জেগে উঠলো তার মধ্যে দুর্দান্তপনা। সে ইচ্ছে করে পা দিয়ে নৌকোটা দুলিয়ে দিল। তারপর কড়া গলায় বললো, শোন রাধা, ভালোমানুষের ঝি, তোমাকে একটা কথা বলি। দেখো, শনশন করে বায়ু বইছে, আমার ফুটো নৌকো দিয়ে কলকল করে জল উঠছে, এখন যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে নৌকো ডুবে গেলে আমি দায়িক হবো না।

রাধা ব্যাকুলভাবে বললো, না, না, এই গহীন নদীতে ডুবে গেলে আমি আর কূল পাবো না।

—ডুবতে তোমাকে হবেই মনে হচ্ছে।

—কানু, তুমি আমাকে বাঁচাবে না?

—তোমাকে বাঁচাবার জন্যই তো আমি এসেছি। কিন্তু সেজন্য আমাকে অবলম্বন করে থাকতে হবে তোমায়। আমাকে শক্ত করে ধরে না থেকেলে স্রোতে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যে।

—কানু, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো! তুমিই তো আমাকে জোর করে তুলে এনেছো নৌকোয়!

—আমি না আনলে তুমি নদী পার হতে কী করে?

—কিন্তু এখন মাঝনদীতে তুমিই আমাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছো।

—ডুবতে গেলে মাঝনদীতেই ডোবা ভালো।

—না, কানু, আমি ডুবতে চাই না। কেন ডুববো?

—ভয় নেই, ডুবলে আমরা দু'জনেই ডুববো, বাঁচলে আমরা দু'জনেই বাঁচবো। তুমি আমায় ধরে থাকো।

—দেখো, নদীতে কত খরস্রোত। নৌকোটা জোরে জোরে দুলছে। তোমার এই ভাঙা নৌকায় এক্ষুনি বুঝি জল উঠবে।

—নৌকো ভাঙা হোক না, আমি মাঝিগিরি জানি ভালো। তুমি ভয় পেও না। আমিই তোমাকে তোমার সঠিক ধামে নিয়ে যেতে পারি।

—সে যে অনেক দূর। এ নৌকো কি ততদূর পৌঁছোবে?

—তোমার সঙ্গে এত চুপড়ি-প্যাঁটরা, তাই তো নৌকো বেশী ভারী হয়ে গেছে।

কানু আবার ইচ্ছে করে জোরে নৌকোটা দুলিয়ে দিল।

রাধা সঙ্গে সঙ্গে বললো, ফেলে দিচ্ছি, আমার বাসনপত্র ফেলে দিচ্ছি জলে।

রাধা নিজে একটা দধিভাণ্ড জলে ফেলে দিতেই কানু উৎফুল্লভাবে অন্য হাঁড়িকলসীগুলোও জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

কিন্তু দুষ্টু কানু তাতেও যেন ঠিক সন্তুষ্ট নয়। সে কপট দুশ্চিন্তার সঙ্গে বললো, উঁহু। এখনো যেন নাওটা ভারি ঠেকছে।

রাধা বললো, আমার যা কিছু ছিল সবই তো ফেলে দিয়েছি।

কানু বললো, না তো! সব তো দাও নি। ঐ যে তোমার গলায় রয়েছে মুক্তামালা। বাজুতে সোনার তাগা। কোমরে গোঠ, পায়ের মল। ওগুলোও কি কম ভারি নাকি? দেখো, আমি রাখাল, আমার কিছুই নেই। তোমার এত কিছু আছে বলেই তো এত জ্বালা!

রাধা গা থেকে একটি একটি করে অলংকার খুলতে খুলতে পরম মায়াভরে বললো, এগুলো সবই ফেলে দিতে হবে?

—তা তো হবেই!

সব অলংকার টুপটাপ করে খসে পড়লো যমুনার জলে। তবু নৌকো টলমল করে!

কানু বললো, এখনো একটু ভারি ভারি লাগছে!

রাধা জিজ্ঞেস করলো, এবার তো আমার যথাসর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তবু কেন ভয় দেখাও?

—না, সব তো দাও নি!

—দিই নি? আর কী বাকি আছে?

—লাজলজ্জা!

পরক্ষণেই নৌকো এমন ভয়ংকর ভাবে দুলে উঠলো যে রাধা আর পারলো না। মহাত্রাসে সে উঠে এসে দু'হাতে কানুকে জড়িয়ে ধরলো।

কানুর চোখে, ওষ্ঠে, চিবুকে, বুকে সারা শরীরে, এমনকি মাথার চুলে পর্যন্ত খুশী উছলে উঠলো। সে বললো, আমাকে

এমনভাবে যদি ধরে থাকো, তাহলে আমি তোমাকে যে-কোনো নদী পার করে দিতে পারি।

কানুর কাঁধে গণ্ড স্থাপন করে রাধা আবেশভরে বললো, আমি প্রাণ ভয়ে যদি তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাতে কি কোন পাপ হয় ?

কানু বললো, কী জানি, পাপ-পুণ্যের কথা অন্য লোকে ভাবে। ওসব আমি জানি না। ওসব আমার মাথাতেই আসে না।

তারপর সহর্ষে, রাধাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, কানু পায়ের ধাক্কায় নৌকোটা উল্টে দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়লো।

মরকতমনি দিয়ে গড়া তরণীর মতন কানু ভাসতে লাগলো জলে। তার বুকের ওপর রাধা যেন এক অজানা দেশের শ্বেতহংসী।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ধুলোভরা গ্রাম্য পথ ভিজিয়ে নিচ্ছে জ্যোৎস্না। চারিদিক সুনসান। তার মধ্যে ভিজে শাড়ি পরা, মাথায় ভিজে চুল নিয়ে হেঁটে আসতে লাগলো রাধা। একা। তার পায়ের শব্দও শোনা যায় না।

গোকুলের পথ দিয়ে এই সময় কোনো নারী একা যায় না। রাধার নিজের কাছে নিজেকেই অপরিচিত মনে হয়। রাত্রির পথ তো সে কখনো চোখে দেখে নি। কোনো কোনো বাড়ি থেকে চেনা নারীকণ্ঠ শুনে তার আরও বিস্ময় জাগে। দু'একজন সখী আগেই ফিরে গেল কি করে? রাধা জানে না, বুড়ো মাঝি একটু পরেই তার নৌকো নিয়ে হাজির হয়েছিল ওপারে। সে বেচারীর নৌকোর দড়ি খুলে কে যেন মাঝনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। অতি কষ্টে সেই নৌকো উদ্ধার করে এসে পৌঁছোতে তার দেরি হয়।

চিন্তামগ্নভাবে রাধা এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে।

চারদিকে কাঠের প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। ভেতরে প্রশস্ত চত্বর, সেখানে তখনও কাজ চলছে। পাঁচ সাতটা বড় উনুনে ঘি জ্বাল দেওয়া চলছে, তার তদারকি করছে স্বয়ং আয়ান ঘোষ।

রাধা যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকলো, কাঠের দরজায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হতেই আয়ান চোখ তুলে তাকালো। রাধার দিকে সে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু একটি কথাও বললো না। অবনতমুখী রাধা পায়ে পায়ে চলে গেল ভেতরে।

এক ঘর থেকে তার ননদিনী বেরিয়ে এসে চমকে উঠে বললো, ওমা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি, বৌ?

রাধা উত্তর দিল না।

ননদিনী তার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললো, একি, সারা গা ভেজা, মাথা ভর্তি জল—এই সন্ধেবেলা কোথায় ডুব দিতে গিয়েছিলি?

রাধা ব্যথাময় দুটি চোখ তুললো। যদি কোনোক্রমে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। যদি কিছু সময়ের জন্যও তাকে একলা থাকতে দিত এইসময়।

রাধার একটা হাত ধরে ননদিনী আবার আঁতকে উঠলো। হাতের সোনার কঙ্কণ কোথায়? গলার হার কই? পায়ের মলও তো নেই। দেখি কোমর দেখি! এটাও তো নেই। কোথায় গেল সব? তোকে ডাকাতে ধরেছিল নাকি?

আচ্ছন্ন গলায় রাধা বললো, হ্যাঁ, ডাকাত!

- অ্যাঁ? কে? কোথায়? বল বল, এক্ষুনি দাদাকে ডাকছি। দেখি, কোন ডাকাতের সাহস আছে আয়ান ঘোষের ঘরণীর গায়ে হাত দেয়।

—না, না, ডাকাত নয়, ডাকাত নয়!

তবে কে? চোর!

—হ্যাঁ, চোর। না, তঞ্চক। না তাও নয়।

তবে কে?

– ঝড়। খুব ঝড় উঠেছিল তো!

—কখন ঝড় উঠলো? আজ তো ঝড় ওঠে নি। ঝড়ে বুঝি গায়ের গয়না খুলে নিয়ে যায়!

—না। ঝড়ও নয়। বলছি! আগে কাপড় বদলে নিই!

রাধার সঙ্গে সঙ্গে ননদিনীও এসে ঢুকল তার ঘরে। দড়িতে মেলা শুকনো জামাকাপড় সেই আগে তুলে নিল নিজের হাতে। রাধার কৈফিয়ৎ না শুনে দেবে না। তারপর বললো, আগে ঠিক করে বল কী হয়েছে? কোনো ভয় নেই। আমি দাদাকে বলবো না—

রাধা বললো, একটা নীল কমল ··

—অ্যাঁ?

—নৌকোয় করে আসছিলাম, একসময় দেখি যে জলে একটা নীলকমল ভাসছে। কী সুন্দর তার রূপ, এমন আর আগে দেখি নি। হাত বাড়িয়ে যেই সেটা ধরতে যাই, অমনি সেটা সরে যায়। একটু যেই বেশি ঝুঁকেছি, অমনি আমার গলা থেকে হারটা খসে গেল। সেটা তোমার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—

—কী সর্বনেশে কথা! তারপর?

—তখন দেখি, সেই পদ্মের মৃণালে একটা সাপ জড়ানো। ভয় পেয়ে সেটা ছেড়ে দিলাম। তারপর সোনার হারের সঙ্গে আমিও ডুবতে লাগলাম। ডুবতে ডুবতে চলে গেলাম একেবারে নীচে, সেখানে

দেখি জোড়াসন করে এক কিশোর বসে আছে। সে দেবতা না দানব, আমি জানি না। তাকে দেখে ভয় করে, আবার ভয়ও করে না। আমাকে দেখে সে অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, তোমাকে আমি মারতেও পারি, বাঁচাতেও পারি। আমি হাত জোড় করে বললাম, আমাকে বাঁচিয়ে দিন। সে বললো, তাহলে তোমার যথাসর্বস্ব আমাকে দাও। তাই দিলাম। একে একে আমার সব অলংকার খুলে···

—আর কিছু দিস নি তো?

—আমার আর কী আছে? দেখো না, আমার সর্ব অঙ্গে রিক্ততা ছাড়া এখন আর কি কিছু আছে?

—বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস তো আজ। শুনেছি জলের তলায় অনেক রকম অপদেবতা থাকে·· তাকে দেখতে কেমন?

—ঠিক যেন নতুন বর্ষার এক টুকরো মেঘ।

—জলের মধ্যে মেঘ? তাহলে তুই দেখলি কী করে?

—ভয় পেয়ে যখন চোখ বুজেছিলাম, তখন আরও ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম।

—ওমা, একি সাংঘাতিক কথা! শুনে আমারই যে বুক কাঁপছে, বউ! যাক বেঁচে গেছিস, এই ঢের। গয়না-গাঁটি গেছে, তোর গয়নার অভাব কী?

এই রোমহর্ষক ঘটনার বিষয়ে ননদিনী আরও বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চালালো। তারপর রাধাকে পোশাক বদলাবার জন্য একা রেখে বেরিয়ে গেল বাইরে।

তখন রাধা দরজায় আগল দিয়ে কাঁদতে বসলো। তাকে এখন অনেক কান্না কাঁদতে হবে। দুঃখের কান্না, সুখের কান্না।

এরপর রাধা আর সহজে বাড়ির বাইরে বেরুতে চায় না। শরীর খারাপের অজুহাত দেয়। একা একা গবাক্ষের ধারে বসে থাকে। কেউ তার অন্তরের ব্যথা বোঝে না। কেউ তাকে ডাকলেও তার কানে আসে না। তার আহারে রুচি নেই। সাজসজ্জায় মন নেই। একটা গেরুয়া-গেরুয়া শাড়িতে তাকে যোগিনীর মতন দেখায়। কখনো সে বেণীবন্ধন খুলে নিজের চুলের দিকে তাকিয়ে থাকে,

কখনো তার চোখ চলে যায় আকাশের মেঘের পানে, আর অমনি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তাদের পোষা ভবন-শিখী দুটি যখন খেলা করে, তখন রাধার দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে শুধু তাদের কণ্ঠের ওপর। ময়ূরকণ্ঠী রং দেখলেই বুঝি তার বুক কাঁপে।

এ-বাড়িতে একটা খুব বুড়ি স্ত্রীলোক থাকে। তার সঙ্গে কার যে কী সম্পর্ক তা বলা দুষ্কর। সবাই তাকে বুড়িমা বলে ডাকে। মানুষটি বড় স্নেহপ্রবণা। বিয়ের পর থেকেই রাধা তার কাছে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে।

সেই বুড়ি একদিন এসে বললো, ওলো নাতনী, তোর কী হয়েছে বল তো ?

রাধা উত্তর দিতে পারে না। তার নয়নে জল, কণ্ঠে বাষ্প এসে যায়।

বুড়ি রাধার গা ছুঁয়ে বললো, কদিন ধরেই দেখছি, তুই ভালো করে খাস্ না, আমার কাছে চুল বাঁধতেও আসিস না। এই কদিনেই কী ছিরি হয়েছে দ্যাখ্ তো! আগে তুই ছিলি একটা সোনার ফুল, এখন হয়েছিল দড়ি। কেন এমন করছিস, মা।

রাধা বুড়িমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলে।

বুড়ি পরম স্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, তুই কি আমাকেও কাঁদাবি! জানিস না, আমি চোখে জল সইতে পারি না। তোর কী হয়েছে, আমাকে বল না!

—বুড়িমা, আমার মরণ হয় না!

—যুবতী মেয়ের তো দু'রকম মরণ আছে। তার মধ্যে এই মরণ তো খুব সুখের। দেখি, দেখি, মুখটা তোল দেখি তুই কোন মরণে মরেছিস ?

রাধা আরও বেশী করে মুখ লুকোয়।

বুড়িমা জোর করে রাধাকে স্নানে পাঠায়। রাধা কিছুই খেতে চায় না, বুড়িমা জোর করে তার মুখে অন্ন তুলে দেয়। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে রাধার মুখের দিকে। তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে বহুকালের পুরনো স্নেহ। এক সময় বুড়িমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাধাকে বলে, নাতনী, তোর দুঃখ আমি বুঝি। বৃষ্টি ছাড়া যেমন চাতকের তৃষ্ণা আর কেউ মেটাতে পারবে না, তেমনি তোর দুঃখও বুঝি একজনই ঘোচাতে পারে। সে কে ? সে কোথায় ?

একদিন বৃন্দা আর ললিতা এলো এ-বাড়িতে বেড়াতে। রাধার শুকনো মুখ, স্থির দৃষ্টি আর রাঙা বাস দেখে তারাও খুব চকিত হয়ে গেল।

দুই সখী রাধার দু-পাশে বসে ব্যাকুল হয়ে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। রাধা সহজে মুখ খুলতে চায় না।

তখন ললিতা একটু রেগে গিয়ে বললো, তোকে আর হাটের পথে দেখি না খেয়াঘাটে দেখি না,—কোথাও দেখি না। তুই কি আর আমাদের সঙ্গে দেখা করবিই না ঠিক করেছিস?

রাধা বললো, না, আমি আর কোথাও যাবো না। আমি আর কোনোদিন হাটে যাবো না, খেয়া পারে যাবো না! আমার ভয় করে!

—কিসের ভয়?

—মানুষের চোখের ভয়, মানুষের কথার ভয়!

—তাহলে তুই অন্তত স্নানের ঘাটেও আয়! আমরা কতদিন কদমতলায় তোর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি।

রাধা কেঁপে বললো, না, না আমি কদমতলাতেও আর যাবো না কোনোদিন।

ললিতা বললো, ভয়ে যেন তোর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে! কেন কদমতলায় কি বাঘ এসেছে নাকি?

বৃন্দা বললো, হুঁ, কদমতলায় প্রায়ই একটা কালো রঙের বাঘ এসে বসে থাকে দেখছি আজকাল!

ললিতা বললো, খেয়াঘাটে সেই বাঘটাই আবার নতুন নেয়ে সেজে আসে!

বৃন্দা বললো, সেই তো আবার হাটের পথে দানী সেজে বসে। অবশ্য আমাদের সে কিছু বলে না। শুধু এক শিকারের দিকেই তার লোভ।

রাধা বললো, থাক্ থাক্ সে কথা থাক!

বৃন্দা বললো, রাই, তুই মরেছিস বুঝি?

ললিতা বললো না, না রাই কিছু করেনি, সেই ছোঁড়াটাই তো জ্বালায়! সেদিন থেকে দেখছি, ছোঁড়াটা এসে জোর করে রাইয়ের ভার বইতে চায়। রোদ লেগে রাইয়ের সোনার অঙ্গ পুড়ে যাবে বলে মাথার ওপর সে এসে ছাতা ধরে, মুখে তাম্বুল গুঁজে দেয়,

সেদিন থেকেই বুঝেছি, ছোঁড়া একেবারে মজেছে। আমাদের তো কেউ কোনোদিন এমন করেনি! তোকেই শুধু সে কেন এত জ্বালায়?

বৃন্দা তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই থাম ললিতা, তুই কি বুঝিস? এক হাতে কখনো তালি বাজে না। রাইয়ের অবস্থা দেখছিস না! কানুর কথা তোলা মাত্র ওর চোখের তারা ঘন ঘন কাঁপছে! দীর্ঘশ্বাস পড়লো ক'বার! দ্যাখ না, ওর গায়ের তাপ কতখানি বেড়েছে। যেন ওর দেহপিঞ্জরটা এখানে পড়ে আছে, প্রাণপাখি চলে গেছে অন্য কাকে খুঁজতে।

ললিতা বললো, সই, আমাদের রাধাকে অমন করে বকিস নি। রাই কোনোদিন আন-পানে তাকায় নি, কোনো দিন একবারও মুখ তুলে কথা বলে নি। কুলের মান রাখতে রাখতেই ও তো এতদিন কাটালো।

বৃন্দা বললো, সে যাই বলিস এবার কিন্তু রাই মরেছে! যেদিন সেই কালো ছোঁড়া নৌকোয় তুলে নিয়ে গেল সইকে, সেদিনই বুঝেছি সই এবার ডুবলো। ললিতা বললো, বালাই ষাট, আমাদের সই ডুববে কেন? আমারা তাকে বাঁচাবো।

বৃন্দা হেসে ফেলে বললো, ললিতে, তুই তো সে ডোবার স্বাদ জানিস না, তুই কী বুঝবি? সে ডোবা থেকে কেউ বাঁচতে চায় না!

রাধাকে নীরব দেখে বৃন্দা এবার ফিসফিস করে বললো, সই, তোকে একটা কথা বলি! সে ছেলেটাও কম যন্ত্রণা পাচ্ছে না। ক'দিন ধরে দেখছি, যেন একেবারে পাগল হয়ে গেছে। মাথার চুলে চুড়ো বাঁধে না, অন্য রাখালদের সঙ্গে ধেনু চরাতে যায় না। সকাল নেই, রাত নেই, মাঠেঘাটে গড়াগড়ি খায়, কখনো এক মনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে দণ্ড প্রহর পার করে দেয়। আমাদের দেখলেই সে ছুটে আসে, মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমরা কিছু বলবো। বুঝি, সে তোর কথাই শুনতে চায়! আহা, বড় কষ্ট হয় আজকাল ছেলেটাকে দেখলে।

মাটিতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে রাধা বললো, আমার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল—দুয়েরই সুনাম আছে। এতদিন আমি সেই দু'কুল নির্মল দেখেছি, আমার কষ্টের কথা কারুকে বলি নি। এখন আমি কী করি বল্ তো? আমি নিজেকে কত কঠিন করে রেখেছি

তাই বাইরে যাই না! অথচ ঘরকে মনে হয় অরণ্য। চন্দনও আমার উত্তপ্ত বোধ হয়। এখন আমি কী করি তোরা বলে দে?

বৃন্দা বললো, এ-বড় কঠিন প্রশ্ন! কানাইকে আমরাও যেন নতুন করে দেখছি। আগে ওকে ভাবতুম উটকো ছোঁড়া। হঠাৎ কী রকম যেন বদলে গেল? ঐ নবজলধর কান্তি, কপাট বুক, করিশুণ্ডের মতন হাত, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা—এমন পুরুষ আর কে কবে দেখেছে? ওর ঐ দৃষ্টির বিদ্যুৎ তোকে ছুঁয়েছে, তোর বুঝি আর উপায় নেই!

রাধা বললো, আমি মনে-প্রাণে চাই ওর সঙ্গে যেন আর আমার দেখা না হয়! যদি দেখা হয়, তবুও যেন প্রণয় অনেক দূরে থাকে। আর যদি প্রণয়ই হয়, তবে সখী তোমাদের বলি, আমার মতন আর কারুর যেন বিচ্ছেদ না হয়! এর কী অসহ্য জ্বালা তোদের বোঝাতে পারবো না। আর যদি বিচ্ছেদই হয় তবে যেন আর দেহ ধরতে হয় না। এর চেয়ে মরণ অনেক অনেক সুখের। সখী, আমাকে এমন কোনো ওষুধ দিতে পারিস যাতে আমার যৌবন জীর্ণ হয়ে যায়?

বৃন্দা বললো, এই মেরেছে! আমরা এলাম তোকে বকুনি দিতে, তার বদলে তুই-ই যে আমাদের কঠিন প্যাঁচে ফেলতে চাইছিস! না বাবা, উঠি! চল ললিতা।

ললিতে সরল বিস্ময়ে বললো, এ কেমন প্রণয় যাতে মানুষ মরতে চায়?

—যার জন্য এই প্রণয়, তাকেই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বাঁচতে কার ভালো লাগে?

—কেন তাকে পাওয়া যাবে না? কানু ছোঁড়া তো মুখিয়ে আছে! বৃন্দা আবার ললিতাকে ধমক দিয়ে বললো তুই থাম তো, তোর আর বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না। রাধা পরের ঘরের বউ, তার প্রণয় যে শরীরের রোগ-ব্যাধির মতন লোকের চোখে পড়ে যাবে! সে যে দারুণ জ্বালা। সেই জ্বালার কাছে প্রণয়ের মতন কোমল কুসুমটি কি বাঁচে?

দুয়ারের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বৃন্দা দেখলো, রাধা মূর্ছিতার মতন দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর প্রবোধ দেবার সুরে বললো, সখী,

যৌবনকে বিড়ম্বিত করিস নি। কাল থেকে আবার হাটের পথে আয়। আবার আমরা এক সঙ্গে গান গাইবো, যমুনায় জলকেলি করবো, ফুলবাড়িতে চয়ন করতে যাবো। কানু যদি কাছাকাছি থাকে তো থাক না। চোখের দেখায় তো দোষ নেই। শুধু একবার চোখের দেখাতেও তো অনেক সুখ!

চোখ বন্ধ রেখে রাধা শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, না। আমি যাবো না। আমি আর কোনোদিন যাবো না!

বৃন্দা আর ললিতা বেরিয়ে গিয়ে বনপথ ধরলো। তাদের অনেকটা দূরে যেতে হবে। দুজনেই গম্ভীর। রাধা তাদের প্রাণের সই। রাধার কষ্ট দেখে তাদেরও কষ্টের অবধি নেই। আজকাল রাধা সঙ্গে থাকে না বলে তাদের পথ দীর্ঘ মনে হয়। কথায় কথায় আর কৌতুক উচ্ছল হয়ে ওঠে না।

যমুনার ধারে ধারে সরু পথ। হঠাৎ এক জায়গায় একটা গাছের ডাল থেকে কানু লাফিয়ে পড়লো তাদের সামনে। ব্যাকুল-ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ললিতা, বৃন্দা, তোমরা রাধাকে দেখতে গিয়েছিলে? সে কেমন আছে?

গোপিনী দুজন প্রথমটা চমকে উঠেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বৃন্দা বললো, সে ভালো আছে। কিন্তু আমার সখীর খোঁজে তোমার কাজ কী!

কানু বললো, তার কাছে আমার একটা মূল্যবান জিনিস জমা আছে, তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম?

—রাধা আবার তোমার কী জিনিস নিয়েছে?

—একটা মুক্তাফল, নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাই আমি ওর হাতে—

ললিতা বললো, বুঝেছি! এসব হচ্ছে ঠ্যাকারের কথা! আমাদের সখীর আর কাজ নেই, সে ওর জিনিস নিতে গেছে! সে রাজনন্দিনী, সে কিনা বাঁদরের হাত থেকে মুক্তো নিতে যাবে?

কানু তবু বললো, কেন, তোমরা ওর বুকের কাছে সেই মুক্তাফল দুলতে দেখোনি!

—না দেখিনি! আমরা দেখলাম, সে নিজের জ্বালায় জ্বলছে। চন্দন তার কাছে বিষতুল্য। পবন যেন হুতাশন! সে চাঁদকে

সূর্য মনে করছে! কানু আমাদের সখী এখন জীবন্ত মরা, তুমি তাকে আর দগ্ধ করো না।

বৃন্দা-ললিতা আবার হাঁটতে শুরু করতেই কানু তাদের পেছন পেছন এসে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো, বলো, বলো রাধার কথা আর একটু বলো—

এক সময় বৃন্দা পেছন ফিরে মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, আ মরণ! আমাদের বুঝি তাড়া নেই, আমাদের বুঝি কলঙ্কের ভয় নেই? সে তো মরতে বসেছে, কালাচাঁদ, তুমিও মরো!

কানু তাদের বারণ মানে না। ভিখারীর মতন অনুনয় বিনয় করতে করতে অনেকক্ষণ ওদের পেছন পেছন যায়।

সন্ধ্যার সমস্ত কাজকর্ম সেরে তারপর আয়ান পুজোর ঘরে ঢোকে। সেখানে সে প্রত্যেকদিনই অনেকক্ষণ থাকে। কালীর পূজা সেরে বেরুতে তার মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যায়। রাধা তখন নিজের খাটে ঘুমিয়ে থাকে। আয়ান এসে একবার স্ত্রীর শয্যার পাশে দাঁড়ায়।

রাধার চুলগুলি খোলা, ওষ্ঠে একটা পাণ্ডু লেখা, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার কপালটা একটু কুঁচকে গেছে, সেখানে দুঃখের ছায়া। ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার বরতনুতে। রাধার সূক্ষ্ম নেত বস্ত্রের আঁচল মিশে গেছে সেই জ্যোৎস্নায়।

ডান হাত বাড়িয়ে আয়ান একবার আলতো ভাবে স্ত্রীর ললাট স্পর্শ করলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এ-ঘর ছেড়ে চলে গেল অন্য ঘরে নিজের শয্যায়।

কে বাঁশি বাজায়, বড়ায়ি, ঐ কালিন্দী নদীর কূলে? বুড়িমা, এই গোকুলের গোষ্ঠে কে অমন বাঁশি বাজায়? আজ যে আমার শরীর বড় আকুল, মন যে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। ঐ বাঁশির শব্দে আমার রান্না সব এলোমেলো হয়ে গেল। বুড়িমা, কে ঐ বাঁশি বাজায় আমি জানি না, তবু কেন ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে তার পায়ে আমি মাথা কুটি? সে তো চিত্তের হরিষে বাঁশি বাজাচ্ছে, কিন্তু তার কাছে আমি কোন্ দোষ করেছি?

বুড়িমা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন রাধার মুখের দিকে। এক সময় বললেন, ও কী, তুই কাঁদছিস কেন মা? এমন মিষ্টি বাঁশির সুর, তা শুনে কেউ কাঁদে?

—ও তো আমাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন সুস্বরে বাঁশি বাজাচ্ছে।

—ও তো নন্দের নন্দন কানু। কদিন ধরেই ওকে দেখছি এদিকে। অমন বাঁশি শুনলে পিঞ্জরের শুক পাখিও উড়ে যেতে পারে।

—আমি তো পাখি নই যে উড়ে যাবো তার ঠাঁই। মেদিনী বিদীর্ণ হলে আমি তার মধ্যে লুকোতাম।

—তোর দুঃখ আমি বুঝেছি মা।

—বুড়িমা, যখন বন পোড়ে তখন জগজ্জন তা দেখতে পায়। কিন্তু আমার মন পুড়ছে যেন কুমোরের পোয়ান।

বুড়িমা, হা-হা করে উঠলো, ও কী, তুই জল ছাড়াই হাঁড়িতে চাল চাপাচ্ছিস কী? একটু আগে দেখলাম, তুই নিমের ঝোলে লেবু টিপে দিলি।

রাধা বললো, আমি আর পারি না। আর পারি না। আর পারি না যে।

ক'দিন ধরে রাধা নিজকে সামলে-সুমলে উঠে বসেছিল। চুল আঁচড়ে, শাড়ি বদলে সে মন দিয়েছিল সংসারধর্মে। কিন্তু আজ আবার সন্ধের পরে রান্না ঘরে বসে ঐ ক্ষ্যাপা বাঁশির সুর শুনে

তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। রান্নায় আর কিছুতেই মনঃযোগ করতে পারলো না। বাঁশির সুর তাকে যেমন উতলা কার, তেমনি হঠাৎ বাঁশি থেমে গেলে সে চাতকের মত অধীর হয়ে পড়ে।

সে-বাঁশি বেজেই চললো, বেজেই চললো। ও কি বাড়ি যাবে না? ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই? ও কি পাগল হয়েছে আজ? রাধা ঘরে থাকতে পারে না, বাইরে আসে। বাইরে থাকতে পারে না, ঘরে আসে আবার। ভাত রান্না করতে গিয়ে সে নুন ফুরিয়ে ফেললো, ডাল রেঁধে সে ফেন গালতে গেল। বুড়িমা তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, তুই সর দেখি, যা ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। রান্না করতে হবে না তোকে। আমি সব দেখছি।

রাত যখন নিশুতি, সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, রাধা তখনও জেগে। তখনও দূরে কোথাও সেই বাঁশি বেজেই চলছে। এখন সেই বাঁশির সুর আরও তীক্ষ্ণ, আরও করুণ। এক সময় রাধার সব সংযম বন্যার তোড়ে মাটির বাঁধের মতন ভেঙে গেল।

চুপিচুপি শয্যা ছেড়ে উঠে এলো রাধা। পায়ের নূপুর আর কটিভূষণ খুলে ফেললো। পরে নিল একটা নীল রঙের শাড়ি। তারপর গুরুজন, দুর্জনের ভয় কিছুই না মেনে বেরিয়ে পড়লো পথে।

রাধার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যই সে রাতে মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে। চাঁদ যেন আঁধার রূপ মদিরা পান করে আজ বেশি পরিমাণে স্ফূর্তি প্রবণ। চারদিকে ফটফট করছে নীল জ্যোৎস্না। রাধার শরীর ও বসন যেন মিশে গেল সেই জ্যোৎস্নায়।

চৈত্র মাসের ছোট রাত, কখন ফুরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। রাত্রির এখন কত প্রহর রাধা তা জানে না। তাই রাধা পথ দিয়ে দ্রুত চলতে যায়। কিন্তু চিত্ত এত অস্থির যে পথের দিকে চোখ নেই। বারবার তৃণাঙ্কুর ফোটে পায়। বেশী জোরে যেতে গিয়ে মাঝে মাঝে পদস্খলিত হয়ে পড়ে যায়, তখন মনে হয় যেন জালেবদ্ধ হরিণী। আবার ছটফটিয়ে উঠে পড়ে। রাধার এখন শরম-ভরম বোধ নেই।

বাঁশির শব্দ অনুসরণ করে করে বনের মধ্যে ছুটতে ছুটতে রাধা এক সময় দেখতে পেল বংশীবাদককে। গাছের ডাল-পালা কেটে মাটিতে বিছিয়ে কানু একটু শয্যা তৈরি করেছে। তার ওপর অজস্র ফুল ছড়ানো।

প্রথম কিছুক্ষণ পরস্পর দৃষ্টিবদ্ধ হয়ে রইলো। কেউ একটা কথাও বললো না। যেন কতদিন, কত মাস, কত বর্ষ পার হয়ে গেল। দুই চোখের মাঝখানে যেন এক সেতু। দু'জনে তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বাতাস উঠলো, গাছের শাখা দুললো, সেই শব্দে ওদের ঘোর ভাঙলো। তার পর দুজনেই ছুটে এসে যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, তখন মনে হলো, মেঘের উপর একটি বিদ্যুৎ-রেখা স্থির হয়ে গেছে।

একটু বাদেই আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে রাধা ভাবলো, কেন এলাম? এ যে না-ফেরার পথ!

কানু ভাবলো, আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যার ধ্যান করেছি, এ কি সে? এ যে তার চেয়েও বেশী। এত রূপ তো আমি চোক্ষে ধারণ করতে পারি নি! ত্রিবেণী জলসঙ্গমে শতযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যে বহু ভাগ্য অর্জন করে, সেই তো এমন রমণীকে পাবার অধিকারী। আমি কি একে পাবো? এ আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে অলীক হয়ে চলে যাবে না তো!

রাধা আস্তে আস্তে বললো, হে নির্দয় কানু, কেন আমাকে এমনভাবে পাগল করলে? আমাকে কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়ে তোমার কী লাভ?

কানু বললো, তুমি ডুববে না, আমরা দু'জনেই আনন্দ বারিধিতে ভাসবো! কিন্তু তুমি কেন আমায় এতদিন দূরে সরিয়ে রেখেছো? আমি যে আর পারছিলাম না! দেখ আমার কপাল কত জ্বরতপ্ত?

কানু নিজের মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল, কিন্তু লজ্জাবশত রাধা তা স্পর্শ করলো না। কানু তখন হাঁটু গেড়ে বসে, দেবীর সামনে ভক্তের মতন ভঙ্গিতে বললো, সুন্দরী রাধা, তুমি সরোবরময়ী। তোমার দেহের লাবণ্যই তোমার জল, কুন্তলদাম যেন তার শৈবাল, তোমার বদন একটি পদ্ম, তোমার নয়ন দুটি নীলকান্ত মণি, নাসিকা যেন স্রোতেভাসা তিল ফুল, তোমার দুই গালে মহুয়া ফুলের আভা। তোমার হাসিতে লোধ্রেণু ··· রাধা, তুমি তো এখনো একবারও হাসো নি।

রূপবর্ণনায় ও স্তুতিতে রাধার মুখ অরুণবর্ণ। সে ঈষৎ পাশ ফিরে প্রস্তরমূর্তির মতন স্থির।

কানু বললো, পায়ের কাছে একটা কীট এলেও মানুষ তার দিকে দেখে। আমি কি কীটের চেয়েও অধম? বলো, বলো, বলো—

রাধা অস্ফুট গলায় বললো, এই ভয়াল রাত্তিরে গৃহশাসন অগ্রাহ্য করে আমি ছুটে এসেছি, কানু, সে কি কোন কীটাণুকীটের জন্য? কানু, তুমি আমার ইহকাল কেড়ে নিয়েছো!

কানুর মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। অত্যন্ত বেশী আনন্দ যেন কষ্টের রূপ ধরলো, সে মাথা ঝাঁকিয়ে আঃ আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলো। তারপর বললো, তুমি যখন কিঞ্চিৎমাত্রও কথা বলো, তখন তোমার দন্তরুচি ঠিক কৌমুদীর মতন বিকশিত হয়। যেন একটা আলো ফোটে, এক নিমেষে অতিশয় আঁধারও দূর হয়ে যায়! প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে আমার শরীর যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তুমি এলে স্নিগ্ধ সরোবরের মতন। তোমার বাহুই যেন মৃণাল, করতল রক্তপদ্ম। তোমার স্তনদ্বয় কনক-কলস, নাভিতে ঈষৎ প্রস্ফুটিত শালুক। তোমার ত্রিবলী যেন ঘাটের স্বর্ণ সোপান, শোভিত জঘনে স্বর্ণপাট—

রাধার মনে হলো, কেন চুলটা একটু বেঁধে আসে নি, কেন নয়নে কাজল দেয় নি একটু, কেন কুঙ্কুম-চন্দনে একটু শরীর-প্রসাধন করে নি! পরক্ষণেই এ-চিন্তার জন্য লজ্জা জাগলো তার মনে। কিন্তু তার অঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। তার কুচ-যুগের ওপর সূক্ষ্ম বসনও যেন গুরুভার বোধ হচ্ছে। তার শরীর যেন তার নিজের বশে নেই আর। তার এতদিনের নারীজীবনে এমনটি দশা আর হয় নি কখনো।

কানু এবার রাধার হাত ধরে পাতার শয্যার ওপর বসালো। রাধা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে রইলো অন্যদিকে। কিন্তু মন মানে না। চোখ চকিতে ফিরে ফিরে আসে কানুর দিকে। তার শরীর যেন অয়স্কান্তমণি দিয়ে গড়া। গলায় বাঁধুলি ফুলের মালা। তার ত্বক যেন কালো রঙের দর্পণ। তার দেহের গড়ন সুঠাম-বলিষ্ঠ, একটুও রুক্ষতা নেই। সবচেয়ে বেশী পাগল করে তার মুখ। ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখ দুটি সদা চঞ্চল।

কানু জিজ্ঞেস করলো, কেন তোমায় আর যমুনার ঘাটে দেখি না? কেন তুমি আর কদমতলায় স্নান করতেও আসো না? আমি

কি এতই বিষ যে আমাকে তোমার চোখে দেখতেও ইচ্ছে করে না ?

রাধা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো। কিন্তু একটু পরেই তার অনুতাপ হলো। কানুর এত ব্যগ্রতাকে সে কী করে প্রতিহত করতে পারে ?

সে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, যদি বলি করে না, তবে সেটা হবে অতি বড় মিথ্যে। সেই মিথ্যেটাই তো আমি আমার মনকে বোঝাতে চাই। কিন্তু মানুষের মনই একমাত্র জায়গা, যেখানে মিথ্যের কোনো স্থান নেই।

—অনেকদিন তুমি বাড়ি থেকে বেরোও নি। মাত্র তিনদিন আগে একবার তুমি সখীদের সঙ্গে বেরিয়েছিলে, সেদিনও তুমি আমাকে দেখতে পাও নি। কিন্তু তার আগেই আমরা পরস্পরকে জেনেছি। তবু তুমি আমাকে ভিনগাঁয়ের মতন অবহেলা করলে ?

—দেখেছিলাম তো সেদিন।

—আমার সঙ্গে কথা বলো নি।

—কানু, তুমি কি লোকসমাজে আমার কলঙ্ক প্রকট করতে চাও ?

—সেদিন তুমি দেখেছিলে. তোমার অবহেলায় অস্থির হয়ে আমি থাকতে পারি নি। আমি একটা পদ্মকোরকে চুম্বন রেখেছিলাম।

—তাও দেখেছি।

—তাতেও আমি নিবৃত্ত হইনি। আমি একটি অবনত দাড়িম্ব লতিকার সুবর্তুল ফলে হাত বুলিয়েছিলাম। তাতেও হয় নি। আমি তখন অশোকপল্লবে দংশন করেছিলাম, দেখেছিলে ?

—সেই দেখে আমি এত অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে মনে হয়েছিলো সখীদের সমক্ষেই মূর্ছিতা হয়ে পড়বো। কানু, আমার শরীর কাঁপছিল, সারা গায়ে স্বেদ বইছিল, তুমি অনেক দূরে ছিলে, তবু আমি লোকসমক্ষে কলঙ্কিনী হয়েছিলাম। তাই আর এক দণ্ডও সেখানে থাকি নি। চলে এসেছিলাম বাড়িতে। সেইদিনই আবার ঠিক করে-ছিলাম, আর আমি বাড়ির বাইরে যাবো না। পিঞ্জরেই আমার স্থান।

—আজ তুমি এসেছো।

—এসেছি ?

—রাধা, তুমি আমার কাছে এসেছো, আজ তুমি স্বয়ম্বাগতা।

—আমার চোখে ঘোর লাগছে। কানু, আমার এ কী হলো? আমি নিজেই জানি না, আমি কখন এলাম, কী করে এলাম। এ স্বপ্ন নয়তো!

—না, স্বপ্ন নয়। এই যে অনুভব করে দ্যাখো আমার হাত।

—হ্যাঁ কানু, এ তোমার হাত।

—দাও, রাধা, সেই পদ্মকোরক, সেই দাড়িম্বের সুবর্তুল ফল, আর অশোকপল্লব।

—তুমি বনের মধ্যে খুঁজে দেখো, ঐ সবই আবার পাবে!

—এত হাতের কাছে সব থাকতে আমি খুঁজতে যাবো কেন!

রাধা তক্ষুণি কানুর হাত ছাড়িয়ে উঠে দৌড়াতে লাগলো। কানু তিন লম্ফে গিয়ে তাকে ধরলো। কিন্তু বলপ্রয়োগ করলো না, কাতর ভাবে বললো, তুমি যদি দয়া না করো, তাহলে আমি তোমার পায়ে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকবো—

রাধা সসঙ্কোচে নিজের পা ঢেকে বললো, না, না, না—

কানু বললো, বুঝেছি, তোমার ও শারদ শশীর তুল্য মুখ তুমি আমাকে ছুঁতে দেবে না। তবে থাক, তোমার পায়ের নোখে যে কতগুলো চাঁদ পড়ে আছে, সেগুলিতেই আমি ওষ্ঠ স্পর্শ করবো···

রাধা বললো, না, কানু, আমার পায়ের নোখে লেগে আছে পথের ধুলো আর কাদা!

—ধুলো আর কাদাই যার প্রাপ্য, সে আর বেশী কী পাবে?

—না, কানু, তোমার জন্যই তো আমার সব!

—কী বললে?

—আমি এতকাল ছিলাম যেন একটা পাথরের মূর্তি, তুমি এসে ছুঁয়ে দিলে বলেই তো আমি প্রাণ পেলাম। অথচ সেই আমিই কী মূঢ়া দেখো, তোমার কাছে আসতেও আমার লজ্জা? কানু, তুমিই তো আমার সব।

—রাধা, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভূষণ। এই ভবজলধিতে তুমিই আমার একমাত্র রত্ন। তুমি সযত্নে আমার হৃদয়ে থাকো।

রাধা নিজেই এবার অত্যন্ত ব্রীড়ার সঙ্গে বসে পড়ে কানুর দুই করতলের মধ্যে তার ঈষৎ স্বেদযুক্ত কম্পিত মুখখানি বন্দী হতে দিল।

সেই মুখে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে কানু বললো, আঃ! রাধার বুকের সূক্ষ্ম বসন সরিয়ে কানু সেখানে মাথা রেখে আবার বললো, আঃ! সেই স্বরে গভীর তৃপ্তি। যেন বহুকাল পরে ঘর ছাড়া এক বালক গৃহে ফিরেছে!

.. তারপর তরল তিমির যেন প্রচ্ছন্ন করে দিল চন্দ্র ও সূর্য। মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল তড়িৎলতা। চতুর্দিকে ছিট্‌কাতে লাগলো ফুল, যেন আকাশ থেকে ঝরছে তারা। অম্বরও খসে পড়লো। পাহাড়চূড়া বিমর্দিত হলো, মেদিনী দুলতে লাগলো। সমীরণ উষ্ণ ও খর বেগে বইতে লাগলো, পাখির চিৎকারের মতন কিছু শোনা গেল, এবং শেষে প্রলয় পয়োধি জলে সব ডুবে গেল। ..

রাধার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঝটিতি উঠে বসেই ভাবলো, আমি কোথায়? চোখ রগড়ে ভালো করে দেখলো, সে এক নিবিড় বন, গাছে গাছে পাখির কাকলি, পাতার ফাঁকেফাঁকে হীরের কুচির মতন রোদের ঝিকিমিকি। পাশে ঘুমিয়ে আছে কানু, পরিশ্রান্ত তবু প্রশান্ত তার মুখ।

রাধা ভেবেছিল, সে বুঝি শুয়ে আছে অমরাবতীতে। এক চঞ্চল মেঘ তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু এ যে চেনা অরণ্য। অদূরেই তাদের বাড়ি। দিনের আলোর মধ্যে সেখানে ফিরবে কী করে?

তবু তো ফিরতেই হবে। রাধা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। কানুকে একবার ডাকবে ভেবেও জাগালো না। ও ঘুমোক, ওর স্বপ্ন ভাঙিয়ে লাভ কী?

রাধা প্রায় ছুটেই চললো। বন ছাড়িয়ে সে যখন পল্লীতে এসে পড়লো, তখন সেখানে অনেকেই উঠে পড়েছে। কেউ উঠোনে জল ছড়া দিচ্ছে। কেউ চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে দুধ দুইতে বসেছে গোয়াল ঘরে। কেউ নিম গাছের ডাল ভাঙছে।

রাধা জানে না, তার মুখ কানুর চোখের কাজলে মাখামাখি। নিপীড়িত ফুলের রস ছোপ ছোপ হয়ে লেগে আছে তার গায়। তার বসন দোমড়ানো। অনেকেই অবাক হয়ে তাকে দেখছে আর ভাবছে, ঐ যে আয়ান ঘোষের ঘরণী সুন্দরী রাধা ছুটে চলছে। কিন্তু এই সাত সকালে সে কোথায় বা গিয়েছিল, কোথা থেকেই বা ফিরছে?

বাড়ির দোরগোড়ায় রাধা ধরা পড়ে গেল ননদিনীর কাছে। ননদিনীর চোখ বড় খরশান। সে রাধাকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠে বললো, ওমা, কোথায় মরতে গিয়েছিলি!

রাধা বললো, মরতেই গিয়েছিলাম, তবু এমন কপাল, আবার বেঁচেই ফিরে আসতে হলো।

দিনের পর রাত আসে, আবার দিন। এইভাবে সময় যায়। কিন্তু রাধার কাছে দিনরাত্রি এখন সব সমান হয়ে গেছে। কখন কানুর সঙ্গে দেখা হবে, সেটাই একমাত্র চিন্তা। দেখা হয়, দুপুরে, বিকেলে বা মধ্যরাত্রে, তার কোনোও ঠিক নেই। রাধা এখন আবার নিয়মিত স্নানের ঘাটে কিংবা হাটের পথে যায়। যদি দূর থেকে কানুকে এক পলকের জন্যও দেখতে পায়। কানুর পীত রঙের বসনের সামান্য আভাসও চোখে পড়ে, অমনি তার শরীর কম্পিত হয়, দৃষ্টি হয়ে যায় স্থির, কপালে দেখা দেয় পুলক-স্বেদ। শুধু দেখাতেই যখন এত আনন্দ, তখন নিভৃতে নিবিড় করে পাওয়ার আনন্দ যেন সহ্যেরও অতীত। যেন মৃত্যুর মতন। এই আনন্দ যে পায় নি, সে জানলো না একই জীবনে বারবার মৃত্যুর স্বাদ কী রকম। তার চেয়ে বড় আনন্দ বারবার করে বেঁচে ওঠায়।

যখন কানুর দেখা পায় না, তখন তার বাঁশির সুরও শোনা যায় না, তখন রাধার মনে হয় পৃথিবীতে শুধু আঁধারও যেন কঠিন পদার্থ, তার একটা শক্ত দেয়াল উঠেছে চারদিকে। রাধা সেই দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে যায়। এমন-কি সে ছুটে যায় গোষ্ঠে, অন্য রাখালদের দিকে চেয়ে থাকে, চোখের পলক পড়ে না, তখন তার সমস্ত শরীরটাই জিজ্ঞাসু।

সখীরা বলে, রাই, তুই কি শেষে পাগলিনী হবি?

যেন পাগলিনী হতে তার বাকি আছে? কখনো সে তমাল গাছকে কানু বলে ভুল করে। কখনো স্নান করতে নেমে যমুনার নীল জলকে এমনভাবে আদর করে কিংবা সেই জলে মুখ রেখে সে এমন মধুরসবাক্য বলে যেন সে কানুর সঙ্গেই আছে।

এদিকে কানুরও সেই একই অবস্থা। এ এমনই এক তৃষ্ণা, যা প্রতিদিনই বাড়ে এবং বেড়েই চলে। এবং যতই বাড়ুক এর আকৃতি কখনো বিরাট বা বেরূপ হয় না। এই তৃষ্ণার কোনো

ক্ষয়কারী শক্তি নেই, তাই মনপ্রাণ এমন মাতিয়ে রাখে। এক বেলা দেখা না হলেই বেঁচে থাকার আর যা কিছু সরঞ্জাম, সব তুচ্ছ হয়ে যায়। রাধা যখন কানুকে দেখতে পায় না তখন আসলে কানু দিগভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও রাধাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সখারা বলে, কানু, তুই শুধু একজনের জন্য আমাদের সবাইকে ছাড়লি! কিন্তু আমরা তোকে ছাড়বো না।

এখন রাধার সখীরা এবং কানুর সখারাই ওদের দু'জনের জন্য দূতিয়ালি করে। নিজেরাই তৈরি করেছে নানা রকম সংকেত। খবর পৌঁছোতে আর দেরি হয় না।

সে রকম কোনোকোনো রাতে ওদের দেখা হয় অরণ্যের মধ্যে সেই নিভৃত কুঞ্জে। রাধা সেদিন চুলে ধূপের গন্ধ দিয়ে সুন্দর করে খোঁপা বাঁধে। যদিও জানে, একটু পরেই সব চুল আলুলায়িত হয়ে যাবে। প্রথমে একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে, তার উপর একটা অতি সূক্ষ্ম লাল রঙের রেশমী বস্ত্র জড়িয়ে নেয়—যাতে লালের মধ্য থেকে নীলের আভা ফুটে বেরোয়। সখীরাই এইভাবে সাজিয়ে দেয় তাকে। বনপথে ছুটে যেতে যেতে সেই বস্ত্র যে একটু পরেই ছিঁড়ে যাবে সখীরা তা জানে না। কোনো সখী তাকে শিখিয়ে দেয়, শোন রাই, আগেই গিয়ে কানুর কাছে আত্মসমর্পণ করবি নে! মেয়েদের একটু গুমর থাকা ভালো। আগে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবি, কানুকে দিয়ে পায়ে ধরে সাধাবি! বক্রবাক্য বলে তাকে চটিয়ে দিবি, বুঝলি? রাধা শান্ত মেয়ের মতন মাথা নেড়ে বলে আচ্ছা!

কিন্তু যখন সে কানুর কাছে ছুটে যায়, তখন আর এসব কিছুই মনে থাকে না। কানুর কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, তুমি আমায় নাও। তুমিই আমার জীবনসর্বস্ব! অন্য মানুষের কত কী থাকে, কিন্তু আমার তো তুমি ছাড়া আর কিছু নেই!

কানু বলে, রাধা, আমি তোমার কাছ থেকে সবই নিই, নিজে ধনী হবো বলে! আমি তো নিঃস্ব, তোমার কাছ থেকে না নিলে আমি ধনী হবো কি করে? আর ধনী না হলে তোমায় কী দেবো? আমি যে তোমাকেই সব দিতে চাই!

এক সময় রাধা আর কানুর যেন একই শরীর হয়ে যায়। একই রকম ব্যথা-বেদনা-আনন্দ। রাধার স্তনে কানুর দাঁত ও

নখরে যখন একটা রক্তের ফুল ফুটে ওঠে, রাধা নিজেই তার সৌন্দর্যে মোহাভিভূত হয়ে যায়। কখন রাত কেটে যায় কেউ টের পায় না।

রাধার বাড়িতে এখন ননদিনীর কঠিন প্রহরা। রাধার সম্পর্কে নানা রকম কানাঘুষা সে শুনেছে, নিজেরও সন্দেহ এখন পাকা—সব সময় তক্কেতক্কে থাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার জন্য। কিন্তু বুড়িমা আড়াল করে রাখে। রাধার সখীরা এবং রাখালরা মিলেও ননদিনীর চোক্ষে ধুলো দেয় বারবার।

এক মাঝরাত্রে ননদিনীর ঘুম ভেঙে গেল। কী যেন শোনার চেষ্টা করলো কান পেতে। কোনো শব্দ নেই, এমন কি ঝিঁঝির ডাক বা মর্মরধ্বনি পর্যন্ত স্তব্ধ। এই স্তব্ধতাটাই যেন সন্দেহজনক। সন্ধেবেলা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছিল একটানা। এখন সেই বাঁশিও থেমে গেছে কেন?

ধড়মড় করে উঠে চলে এলো রাধার ঘরে। শূন্য শয্যা। তার ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে চাঁদের আলো, দেখে মানুষ বলে ভ্রম হয়। ননদিনী হাত দিয়ে সেই শূন্যতা স্পর্শ করে দেখলো। রাধার গায়ের অলঙ্কারগুলি কেন খুলে রাখা আছে বিছানায়? সে 'দাদা' 'দাদা' বলে চেঁচিয়ে আয়ানের ঘরের দোরে ধাক্কা মারলো। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল আয়ান। কোনো দিন এই ভাবে কেউ ডেকে তার ঘুমের ব্যাঘাত করে নি। আয়ান দরজা খুলে বাইরে আসবার পর তার বোন বললো, তোমায় বলেছিলাম না? আজ মিলিয়ে দেখো!

এর আগেই ক'দিন ধরে ননদিনী তার দাদার কাছে রাধা সম্পর্কে লাগানিভাঙানি দিতে গিয়েছিল। আয়ান বিশেষ কান দেয় নি। আজ এত রাত্রে বোনের এতখানি গরজ দেখে সে আর উড়িয়ে দিতে পারলো না। প্রথমে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো। রাধা সত্যিই কোথাও নেই।

তখন আয়ান জিজ্ঞেস করলো, সে কোথায় গেছে, তুই জানিস?

ননদিনী বললো, শুনেছি ওরা বনের মধ্যে একটা রমণকুঞ্জ বানিয়েছে! লোকে বলে, আমি তাতে বিশ্বাস করিনি।—

—কোথায়? চল।

পদপাতে ভূমি কাঁপিয়ে আয়ান চললো বনের দিকে। তার এক হাতে খড়্গ। অবারিত জ্যোৎস্নায় আয়ানের দীর্ঘ শরীরের দীর্ঘতর

ছায়া পড়েছে পথে। তার ছোট বোন দৌড়ে দৌড়ে এসেও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

খানিকটা গিয়ে আয়ান থমকে দাঁড়ালো. কুঁচকে গেল ভুরু। যদি সত্যিই দেখা হয়ে যায়? যদি সত্যিই চোখের সামনে প্রমাণিত হয়ে যায় যে রাধা কলঙ্কিনী? না, না, থাক। লোকের মুখে শোনা এক কথা আর নিজের চোখে দেখা অন্য জিনিস। চোখে দেখার পর আয়ান কী করবে?

—দাদা, থামলে কেন? আরও যে অনেকটা দূর!

বোনের কথায় আয়ান আবার চলতে শুরু করে। বোনকে সে কী বোঝাবে তা ভেবে পায় না। রাধার বিয়ের সময়কার মুখখানা তার মনে পড়ে। স্বর্ণময়ী কিশোরীর অপাপবিদ্ধা মুখ, প্রথম দিন সেই মুখ দেখে আয়ানের কষ্ট হয়েছিল। আজও বুকটা টনটন করে। ঐ মেয়ের যোগ্য সমাদর কি সে করতে পেরেছে? কিছুই পারে নি।

বনের মধ্যে আলো ছায়ার আঁকিবুকি। পায়ের চাপে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ হয়—হঠাৎ ভয় পেয়ে ডেকে উঠে দুটো-একটা রাতপাখি। আয়ান আবার একবার থেমে গিয়ে বলে, আর যাবো না!

বোন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন দাদা, আর তো বেশী দূর নেই।

আয়ান বললো, থাক। এ শুধু মরীচিকার পেছনে ছোটা।

—না, দাদা, আমি ঠিক জানি।

আয়ান বোনকে এক ধমক দিয়ে বললো, বিশ্বশুদ্ধ লোক বললেও আমি রাধাকে অবিশ্বাস করি না।

—যদি নিজের চোখে দ্যাখো?

—দেখবো না!

—আমি বলছি তুমি ঠিক দেখতে পাবে। আর একটু চলো

—দেখবো না!

—তার মানে? তুমি ইচ্ছে করেই দেখতে চাও না?

—না, না, চল—

আরও একটু দূরে যাবার পর আয়ানের বোন আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে পরপর কয়েকটা কদম্ব গাছ, ডালপালা দিয়ে বেঁধে মাঝখানটা ঘিরে রাখা হয়েছে, ঠিক যেন একটা ঘর, দেখছো, আমি ঠিকই শুনেছিলাম—একটু একটু শব্দও শোনা যাচ্ছে—

আয়ান কঠোরভাবে বললো, তুই এখানে দাঁড়া, তোকে আর একটুও যেতে হবে না।

আয়ান মন্থর পায়ে হেঁটে গেল সেই ঝোপের দিকে। বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগলো, সব যেন মিথ্যে হয়।

ঝোপের কাছে এসে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। বেশী চেষ্টা করতে হলো না, অচিরেই দেখা গেল।

একটি কদম গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। নবীন মেঘের মতন গায়ের রং। একটি পীতরঙের উত্তরীয় জড়ানো। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। তার মুখখানা ভালো দেখা যায় না, তার একটি হাত সামনে বাড়ানো। সেই হাতখানা যেন বিশ্বের সেরা শিল্পীর গড়া। যেমন কোমল তেমনি দৃঢ়। সেই পুরুষের পায়ের কাছে বসে আছে রাধা।

রাধার মাথার চুল খোলা, আঁচল বিস্রস্ত, পুরুষের পা জড়িয়ে ধরে আছে সে ব্যাকুল মিনতির ভঙ্গিতে, মুখখানা ওপরের দিকে তোলা, কুরঙ্গিনীর মতন চোখ দুটি সেই পুরুষের মুখে স্থির।

আয়ানের প্রথমেই মনে হলো, এ-রকম অপরূপ দৃশ্য সে জীবনে দেখে নি। সে তো সারাজীবনটা শুধু বিষয় কর্ম বা পুজোআচ্চা করেই কাটালো। সে তো জানতেই পারে নি, মানুষ কখনো মানুষের দিকেও অমন করে চায়। এই রাধা তার এতদিনের চেনা, কিন্তু এখন যেন একেবারে অচেনা হয়ে গেছে।

মনে হয় ওদের দু'জনের যেন বাহ্যজ্ঞান নেই। আয়ান বা অন্য কেউ যে এসেছে কাছাকাছি, সে দিকে কোনো হুঁশই নেই—শুধু সেই বিভোর দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখা। আয়ান অপেক্ষা করলো, ওদের মুখ থেকে কথা শোনবার জন্য। আশ্চর্য মুহূর্ত পল কেটে যায়, ওরা একটাও কথা বলে না। একটু নড়ে না পর্যন্ত।

আয়ানের গা ছমছম করে উঠলো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অলৌকিক নয় তো? এই নিঝুম মধ্যরাত, জ্যোৎস্নাময় অরণ্য, তার মধ্যে নিথর নির্বাক দুই মূর্তি। প্রাণবন্ত যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আয়ান ওদের ত্বকের চিক্কণতা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এমন স্পন্দনহীন, শব্দহীন হয়ে স্থির হয়ে আছে কেন? পুরুষটি কি

তার হাত বাড়িয়ে অভয় দিচ্ছে রাধাকে? কিন্তু রাধার চোখে তো ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। রয়েছে আকুতি। সব মিলিয়ে যেন এক পবিত্র সৌন্দর্য।

আয়ানের খড়্গসমেত হাত ওপরে উঠলো না। রাধাকে সে ডাকতেও পারলো না। পায়েপায়ে পিছিয়ে এলো। খানিকটা পরে সে উল্টো দিকে ফিরে গতিবেগ বাড়ালো।

তার বোন তাকে প্রায় ঘোরগ্রস্ত অবস্থায় ছুটতে দেখে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো? কী দেখলে দাদা?

আয়ান বললো, কিছুই দেখি নি! চল্।

যত জোরে এসেছিল, তার চেয়েও বেশী গতিবেগে আয়ান ফিরে গেল বাড়ি। সোজা গিয়ে ঢুকলো তার পুজোর ঘরে। কালীমূর্তির সামনে জোড়াসনে বসলো চোখ বুজে। তবু তার বন্ধ চোখ দিয়েও টপটপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জল। সারা রাত ধরে।

গোধূলির সময় রাখালরা বাড়ি ফিরছে, কোথা থেকে কানু এসে হাজির। সারাদিন তার পাত্তা ছিল না। সে কখন আসে, কখন চলে যায়, তার ঠিক নেই। বলরামই আজকাল বেশীর ভাগ যশোমতীর ধেনুগুলির দেখা শুনো করে। নির্বিরোধ বলরাম কানুর কোনো ব্যবহারেই আপত্তি করে না।

রাখালরা সবাই অবাক।

সুবল বললো, তোর কি দিনরাতের জ্ঞান গম্যিও চলে গেছেরে, কানু? দেখছিস না দিনমণি অস্তাচলে যাচ্ছে? তুই বুঝি ভেবেছিস, এখন প্রভাত হলো?

কানু অদ্ভুত ধরনের হেসে বললো, তাই তো এখন প্রভাত নয় বুঝি? তা হোক না সন্ধে, এখন আবার গোষ্ঠে যেতে ক্ষতি কী?

—কী করবি গোষ্ঠে গিয়ে?

—কেন, খেলবো?

অংশুমান বললো, সারাদিন ওনার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকি তখন দেখা নেই, এখন উনি এলেন খেলতে। তোর যদি এত শখ থাকে, তা হলে একা খেল গে যা!

সুদাম বললো, আজ বুঝি শ্রীরাধিকে আসেন নি, তাই বাছার আমার খেলার কথা মনে পড়লো।

কানু বললো, সে আজ আসে নি, কাল আসে নি, অনন্তকাল আসে নি!

—তাই-তো বড় ভাবনার কথা। আমাদের বলিস নি কেন, বৃন্দের কাছে সন্দেশ পাঠাতুম!

কানু হঠাৎ কালু নামের বিরাট চেহারার বৃষটির ল্যাজ মুচড়ে দিল। সেটা চমকে গিয়ে, ক্ষুরের ধাক্কায় মাটি ছিটকিয়ে লাফিয়ে উঠলো। তার ভয়াল শিংশুদ্ধ মাথাটা ঘুরে গেল এদিকে ওদিকে। তা দেখে অন্য গাভীরাও ভয় পেয়ে ছটফট করে উঠলো।

সব রাখালরা হা হা করে উঠলো। আরে কানু করিস কী। করিস কী?

কিন্তু কানু মজা পেয়ে গেছে। সে দৌড়ে দৌড়ে অন্য ধেনুদেরও ল্যাজ মুচড়ে দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, ইঃ-রে-রে-রে-রে!

ধেনুদেরও মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। কোনোটা এদিক-ওদিক ছুটে যায়, কোনোটা একে-তাকে ঢুস মারতে আসে। কানু সেগুলিকে আরও ক্ষেপিয়ে দেয়, কোনোটার শিং ধরে দৌড় করায়, কোনোটার কর্ণ মর্দন করে।

রাখালরা প্রথমে দিশেহারা, পরে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কানু আগে কোনো দিন এমন কাণ্ড করে নি! ধেনুগুলিকে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতো। আজ এমন নির্দয়ভাবে ওদের কষ্ট দিচ্ছে কেন? অবলা প্রাণীগুলি পর্যন্ত যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। ছেলেটা কি সত্যি পাগল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত!

রাখালরা সে-সব ধেনুগুলি সামলালো অতিকষ্টে। অভিমানরুদ্ধ গলায় তারা বললে, দেখো ভাই কানু, শ্রীরাধিকা আসে নি, সে কি আমাদের দোষ? তবে আমাদের এই বিড়ম্বনা কেন?

কানু বললো, সে আজ আসে নি, কাল আসে নি, অনন্তকাল আসে নি!

—সে জন্য আজ আমরা আর কী করবো? কাল বরং সন্ধান নেওয়া যাবে।

কানু বললো, আজ আমরা খেলা করি আয়!

—আমাদের এখন খেলায় মন নেই ভাই। সারাদিন রোদে কাটিয়েছি, এখন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর জ্বলছে!

রাখালরা সত্যিই বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিচ্ছে দেখে কানু বললো, আয়, তোদের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করবি?

কানুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নামার ইচ্ছে কারুরই নেই। কেই-বা এই সন্ধেবেলা হাত পা ভাঙতে চায়! কানুর যেমন অদ্ভুত শখ।

কেউ কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁটতেই লাগলো।

কানু আহতভাবে বললো, কিরে, তোরা খেলবিও না, লড়বিও না? রাখালরা তখন প্রায় পল্লীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। কানু তেড়ে ছুটে গেল তাদের দিকে। এক একজনকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলো মাটিতে, কারুর উড়নি, কারুর পাচনবাড়ি কেড়ে নিল। কানু আজ দারুণ অস্থির।

মাটিতে কয়েক পাক গড়াগড়ি দিয়ে রাখাল ছেলেরা আবার উঠে দাঁড়ালো। এখনো তারা ক্রুদ্ধ হয় নি, তবু দুঃখিত অভিযোগে বলতে লাগলো। কানু, কেন আমাদের জ্বালাতন করছিস? আমরা তোর কাছে কী দোষ করেছি?

কানু বললো, কেন তোরা খেলবি না? কেন তোরা লড়বি না?

তবু কেউ লড়তে রাজি নয়। তবু কানু তাদের টানা টানি করতে ছাড়ালো না। এক একজনকে তুলে তুলে ধরাশায়ী করতে লাগলো। শুধু বলরামকে ছাড়া। বলরাম এসব দেখেশুনেও একটিও কথা বলে নি। শুধু এক পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

কয়েকজন অকারণ মার খাওয়ার বদলে কানুর সঙ্গে লড়তে গেল। এবং অচিরেই কয়েক আছাড় খেয়ে উঃ আঃ করতে লাগলো বসে বসে। কানু হা-হা করে হাসতে হাসতে বললো, তোরা কেন আমার সঙ্গে ভালো করে লড়তে আসিস নি?

কানুর ঘামে ভেজা মুখখানা জ্বলজ্বল করছে। মুখে অন্যরকম একটা দ্যুতি। চোখ দুটো অন্যদিনের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল। সে আজ দুর্দান্ত চঞ্চল।

সমস্ত রাখালরা যখন কাবু হয়ে কোঁকাচ্ছে, তখন কানু কোমরে গোঁজা আড় বাঁশিটা বার করলো। তার চাঞ্চল্য একটুও কমে নি। সে বাঁশিতে এক দারুণ ফুঁ দিল।

এমন সুর কানু নিজেও আগে কখনো তোলে নি। এ যেন এক পাগলের বুক ফাটা আর্তনাদ। তবু তার মধ্যে এক অদ্ভুত ছন্দ আছে। বিস্মিত বিহ্বল রাখালদের মাঝখানে নেচে নেচে কানু বাজাতে লাগলো সেই প্রাণ মাতোয়ারা বাঁশি।

যে-হেতু লোকালয় খুব কাছেই, তাই সেই তীব্র বাঁশির নাদ শুনে একে একে খুলে যেতে লাগলো বিভিন্ন গৃহের ঝরোকা। অনেকেই বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রথমে তারা দূর থেকে বাঁশি শুনলো। তার পর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো। আরো কাছে। বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলো কানুকে। একে যেন তারা কেউ চেনে না। এমন বাঁশির সুরও তারা কখনো শোনে নি। সে বাঁশি শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শরীর দোলে সাপের ফণার মতন। এক সময় তারা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বাঁশির

সুরে গা ভাসিয়ে নাচতে শুরু করলো। তখন দেখা গেল, তারা সকলেই নারী।

এক সময় কানু ঈষৎ অহঙ্কারের সঙ্গে জনান্তিকে সুবলকে জিজ্ঞেস করলো, আমার বাঁশি শুনে শুধু নারীরাই আসে কেন? পুরুষরা কোথায়?

সুবল শ্লেষের সঙ্গে বললো, কেন ভাই, নারীদের প্রতিই তো তোমার আসক্তি, পুরুষের খোঁজে কী প্রয়োজন? তারা এলে তো তোমার ব্যাঘাতই হতো!

কানু বললো, সে কথা নয়। তারা আসে নি কেন?

—রাজা কংসের হুকুমে সমস্ত পরিবার প্রধানরা আজ মথুরায় গেছে। তুই তো আজকাল প্রজাতি বা প্রদেশের কোনো খোঁজই রাখিস না। তাই জানিস না, রাজা কংসের অত্যাচার আজ আবার কত বেড়েছে। কতরকম অনুজ্ঞা আর অনুশাসন।

কানু বেশী খেয়াল করলো না সুবলের কথা। এখন অনুযোগ শোনার দিকে তার মন নেই। সে হাঁটতে সুরু করলো বনের দিকে। এক সময় বনের মধ্যে পৌঁছে ও দেখলো, সমস্ত গোপিনীরা তাকে অনুসরণ করে এসেছে। ক্রমশ তাদের দল বাড়ছে। কানুর বাঁশির সুরে তাদের অঙ্গে দোলা লেগেছে। সুখে আবিষ্ট হয়ে নাচছে তারা বনের মধ্যে। সকলেই মধুর স্বরে বারবার বলছে, কানহাইয়া, আমার কাছে এসো। ওগো মুরলীমোহন, তুমি একবার সামনে এসে এই অধীনাকে ধন্য করো।

কানু আবার ফিসফিসিয়ে সুবলকে জিজ্ঞেস করলো, এত গোপিনীই যখন এসেছে, তখনও তবুও, রাধা এলো না কেন?

সুবল বললো, কী জানি ভাই। সে তত্ত্ব তো তোমারই ভালো জানবার কথা!

—আমি জানি না, সে কেন এলো না।

—হয়তো এত গোপিনী এসেছে বলেই সে আসে নি।

—কেন? এরা এসেছে বলে সে আসবে না কেন? এরা আর সে কি এক? সে-ই তো আমার একমাত্র পুরস্কার। সে কেন এলো না? বল্ সুবল তুই শিগগির উত্তর দে, রাধা কেন এলো না?

এতো দেখছি মহা জ্বালাতন! এত সব কথা আমি জানবো কী করে? আজ লক্ষ্মীপুজোর দিন, হয়তো ওদের বাড়িতে কোনো ব্রত-পার্বণ আছে—তা ছাড়া জানিস তো ওর ননদিনী কত কুটিলা।

কানুর আর কিছুই ভালো লাগালো না। সে আরও জোরের সঙ্গে বাঁশি ফুঁ দিয়ে সকলকে ক্ষেপিয়ে দিতে চাইলো। নাচের নেশায় সকলেই যখন প্রায় উন্মাদ, সেই সময় কানু কারুকে কিছু না বলে চুপিচুপি পালিয়ে গেল বনের মধ্যে। ছুটতে ছুটতে, একলা, বনের মধ্যে আরও ক্রমশ একলা হতে হতে কানু এক সময় হারিয়ে গেল গভীর থেকে গভীরতর বনে।

ক'দিন ধরে রাধার দেখা নেই, তার কোন সংবাদ নেই, সংকেতকুঞ্জ শূন্যতায় হা-হা করে। কানু বারবার স্নানের ঘাটে যায়, খেয়ার ঘাটে যায়, কদম্বতরুর তলায় গিয়ে বসে থাকে, তবু রাধাকে দেখে না। কানুর ইচ্ছে করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে। ক্রুদ্ধ সিংহের মত সে বনের মধ্যে একা একা গজরায়।

পরদিন দুপুরবেলা কানুকে আবার আবিষ্কার করলো সুবল। নিঃসঙ্গ যমুনাতীরে। কদমগাছের নীচে। দীর্ঘশ্বাসবহুল মলিন মুখ নিয়ে বসে আছে। কালীয়দহের পাড়ে রাধাকে প্রথম দেখার পরের মতন ঠিক একই অবস্থা।

সুবল প্রথমেই বললো, আমি পাকা খবর নিয়ে এসেছি। রাধা এখন আয়ানের বাড়িতে নেই।

কানু চকিতে মুখ তুলে বললো, কোথায়?

সুবল বললো, রাধা গেছে তার বাপের বাড়ি। কেউ বলছে, আয়ানই সেখানে তাকে পাঠিয়েছে। আবার কেউ বলছে, রাজা বৃষভানু মেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে শুনে নিজেই তাকে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার এমন কথাও শুনছি সখীদের মুখে যে, কানু এক সঙ্গে অনেক গোপিনীর সঙ্গে লীলা করছে বলেই রাধা অভিমান করে গোকুল ছেড়ে চলে গেছে ব্রজপুরীতে।

—হতেই পারে না!

—কী হতে পারে না?

—রাধা আমার ওপর রাগ করে কখনো যাবে না। সে তো জানে, তাকে একদিন না দেখলে আমার চোখে দুনিয়া ছারখার

হয়ে যায়! সে কি আমাকে এতটা শাস্তি দিতে পারে? তাকে নিশ্চয়ই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—সে যাই হোক, রাধা যে বৃষভানুপুরীতে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কানু বললো, আমি বৃষভানু রাজার আলয়ে যাবো?

সুবল তার হাত ধরে টেনে বললো, আরে পাগল, বোস্ বোস্ এখুনি কোথায় যাবি তুই?

কানু বললো আমি বৃষভানু রাজার আলয়ে যাবো।

—যাবো বললেই কি যাওয়া যায়? সেখানে তোকে ঢুকতে দেবে কেন?

—ঢুকতে দেবে না?

—কেন দেবে? আমরা রাখাল ছেলে, ইচ্ছে করলেই কি হটহাট করে রাজার বাড়ি ঢুকে পড়তে পারি?

—আমি দ্বার ভেঙে ঢুকবো।

—তা তুই পারিস। কিন্তু তাহলেও সান্ত্রী আর প্রহরীরা তোকে ঘিরে থাকবে। দ্বার ভেঙে ঢুকে কি আর রাজনন্দিনীর দেখা পাওয়া যায়?

কানু একটুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর সুবলের যুক্তি মেনে, তাকে অনুনয় করে বললো, ভাই সুবল, তুই তো অনেকরকম কলাকৌশল দেখাতে পারিস, আমাকে দু'একটা শিখিয়ে দে না।

সুবল বললো, তাতে অনেক সময় লাগবে। ওসব জাদুবিদ্যা কি আর এক আধ দিনে শেখা যায়!

—তবে আমাকে কোনো একটা ভান শিখিয়ে দে। কিংবা আমাকে অন্যরকম কিছু সাজিয়ে দে।

—তুই কী সাজতে চাস?

—আমি নাপতেনী সেজে রাধার পায়ে আলতা পরাতে যেতে পারি, কিংবা চুড়িওয়ালি সেজে গিয়ে রাধার হাতে চুড়ি পরাবো।

—তুই এর একটাও পারবি না। ধরা পড়ে যাবি।

—তাহলে একটা উপায় বলে দে।

—চল, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

সুবল জাদুবিদ্যা আর নাট্যরঙ্গ বেশ ভালোই জানে। এর জন্য তার বেশ কিছু সাজসরঞ্জাম আর বাদ্যযন্ত্রও আছে। সঙ্গীও আছে

তিন চারজন। তারা সবাই মিলে সাজপোশাক বদলে নাটুয়া সাজলো, মুখে লাগালো শন আর পাটের দাড়িগোঁপ। তারপর ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে চললো বৃষভানু রাজার পুরীর উদ্দেশে।

বৃন্দাবনের মাঠ পার হয়ে তারা যখন ব্রজের দিকে যাচ্ছে, তখন দেখলো পথের ধারে একজন সাধুর মতন লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর চিৎকার করছে, জল, একটু জল, জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল ..

সুবল তাই দেখে বললো, লোকটা এখনো মরে নি, আশ্চর্য তো!

কানু বিস্মিতভাবে বললো, লোকটা কে?

—কী জানি! ভিন দেশি সাধু। ক'দিন ধরেই শুয়ে শুয়ে ঐরকম চ্যাঁচাচ্ছে।

—তা কেউ ওকে জল দেয় না কেন?

—ও নেবে না, মহাপাজী, ওসব ওর ভান। দেখবি?

সুবল রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল লোকটার দিকে। খানিকটা কাছাকাছি যেতেই বৃদ্ধ চোখ ঘুরিয়ে দেখলো সুবলকে, তারপর ধমক দিয়ে বললো, এই কাছে আসবি না। ছুঁবি না আমাকে, ছুঁবি না, তাহলে শাপ দেবো—

সুবল আবার দৌড়ে পিছিয়ে এসে বললো, দেখলি! ওর কাছে না গেলে ওকে কেউ জল দেবে কী করে? শাপ দেবার ভয় দেখায়? দূর দূর, এই অপয়াটাকে দেখলাম, এখন আমাদের কাজ হলে হয়!

কেউ আর মাথা ঘামালো না বুড়োকে নিয়ে, রাজবাড়ির দিকে ছুটে চললো। তখন সবে সূর্যাস্ত হচ্ছে, সারা আকাশে ছড়িয়ে গেছে পাকা সোনার রং। সেই রং গায়ে মেখে চলে গেল এই আনন্দ উচ্ছল তরুণেরা।

রাজবাড়ির দ্বারে সান্ত্রী এসে বাধা দেবার আগেই সুবল গিয়ে বললো, আমরা ভিনদেশী নাটুয়া। আমরা রাজার মনোরঞ্জন করতে এসেছি। আমরা ক্ষুধার্ত, রাজা অনুগ্রহ করলে আমরা রাজপুরীর প্রসাদ খাবো।

সান্ত্রী বললো, রও, তোমরা এখানে রও, আমি আগে রাজাকে জিজ্ঞেস করে আসি।

ব্রজপুরে প্রৌঢ় রাজা-রানীর নিস্তরঙ্গ জীবন। সন্ধ্যার সময় আমোদ প্রমোদের উপকরণ সবই চিরাচরিত হয়ে গেছে। নতুন কৌতুকের সংবাদ পেয়ে রাজা খুশী মনেই সম্মতি দিলেন।

সুবলের দল মহা উৎসাহে রাজসভা মণ্ডপের মধ্যে মঞ্চ নির্মাণ করতে লেগে গেল। মঞ্চের পেছনে একটা গুপ্ত ঘরও বানালো নিজেদের সাজ পরিবর্তনের জন্য। কানুকে বসিয়ে রাখলো সেই ঘরে।

সভামণ্ডপে জ্বালা হয়েছে অনেকগুলি ঝাড়বাতি। তাদের স্বর্ণময় দণ্ডে আলো পড়ে যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মাথার ওপরের চন্দ্রাতপে হীরে মুক্তোর চুমকি বসানো। মঞ্চের ঠিক সামনেই রাজা বসেছেন পাত্রমিত্রদের সঙ্গে নিয়ে। তার পেছনে রাজবাড়ির অন্য পুরুষরা। খবর পেয়ে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে পেছনে ভিড় করেছে। দু'পাশের অলিন্দে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের যবনিকার আড়ালে বসেছে বাড়ির মেয়েরা। জননী কৃত্তিকার পাশে বসেছে রাধা আর তার সখীরা। তাদের রূপের ছটা ঐ যবনিকা ভেদ করে আসে।

যথা সময়ে সঙ্কেত দিয়ে রঙ্গ শুরু হলো। প্রথমে একেবারে শূন্য মঞ্চ, আড়ালে নানারকম বাদ্য বাজছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃহৎ একটা বরাহ ঢুকে পড়লো মঞ্চে। এবং ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগলো। মঞ্চের ওপর একটি বন্য বরাহ দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল দর্শকরা। বুঝতে সময় লাগলো যে, ওটা একজনের সাজ।

বরাহের সামনে দুটি তীক্ষ্ণ দাঁত। সেই দাঁত দিয়ে সে মঞ্চের ভূমিতে আঘাত করলো। তারপর ঘাড় শক্ত করে এমন চাপ দিল যে একটু বাদেই মনে হলো, শুধু মঞ্চ নয়, গোটা সভাগৃহ এমন কি সম্পূর্ণ মেদিনীই দুলছে ঐ বরাহের দাঁতের ধাক্কায়। তখন সবাই বুঝলো, এটা বরাহ অবতারের অভিনয়। সবাই সাধুবাদ দিল।

এর পর সুবল মঞ্চের পেছনের গুপ্ত ঘরে এসে অচিরেই বরাহের সাজ বদলে এক বামনে রূপান্তরিত হলো। কী তার দীর্ঘ শরীরটাও খর্ব করে ফেললো, সেও এক বিস্ময়। এদিকে মধুমঙ্গল সেজেছে বলিরাজা। মঞ্চের ওপর বলিরাজা ও সেই বামনের যুদ্ধ শুরু হলো। এক সময় সেই বামন অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বলিরাজার মাথার ওপর এক পা রেখে এমন চাপ দিল যে বলিরাজা সশরীরে ঢুকে গেল মঞ্চের নীচে। এই বামন অবতারের রূপ দেখেও সকলে সাধুবাদ দিল।

পরের দৃশ্যে অংশুমান সাজালো হিরণ্যকশিপু। সে বালক প্রহ্লাদবেশী শ্রীদামের ওপর নানা অত্যাচার করছে এমন সময় মঞ্চে সদর্পে প্রবেশ করলো নৃসিংহ অবতার। কী সাংঘাতিক তার রূপ! নীচের অর্ধেকটা মানুষের মতন, উপরের অংশ যেন প্রকৃত সিংহ, কেশর ভর্তি বিরাট মাথা, ভাঁটার মতন জ্বলন্ত চোখ, হাত দুটিও সিংহের থাবা। সে অবলীলাক্রমে হিরণ্যকশিপুকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুক চিরে দিতে লাগলো। এমনই অপরূপ ভঙ্গিক যে সত্যিই মনে হলো হিরণ্যকশিপুর বুক চিরে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। সেই সঙ্গে সিংহের হিংস্র গর্জন।

সভামণ্ডপে প্রথমে কিছু অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল। তার পর রীতিমতন ভয়ার্ত চিৎকার। রাজা বৃষভানু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, থাক, থাক, আর নয়! নাটুয়ার দল, তোমরা চমকপ্রদ খেলা দেখিয়েছো। কিন্তু আর দরকার নেই, আমার লোকেরা ভয় পাচ্ছে।

সুবল তখন সিংহের মুখোশ খুলে ফেলে দুই হাত জোড় করে বললো, মহারাজ, আমাদের আর একটা মাত্র খেলা বাকি আছে, সে খেলাতে ভয়ের কিছু নেই। তাতে শুধু একটা গীত শুনবেন। সেটা দেখাতে পারি?

রাজা বললেন, তাই হোক!

মঞ্চে যবনিকা ফেলে সুবলরা আড়ালে চলে গেল। একটু পরে যখন যবনিকা উঠলো, তখনো দেখা গেল, মঞ্চের ওপর একটা কৃত্রিম কদম গাছ, তার নীচে রাখাল রাজার বেশে দাঁড়িয়ে আছে কানু। তার মাথায় শিখিপুচ্ছের মুকুট, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা, পীত রঙের কটি বসন আর উত্তরীয়। কী অপূর্ব মনোহর তার রূপ! অভিনয়ে অপারগ বলে কানুর লজ্জামাখা মুখখানি নীচের দিকে করা। সে আড়বাঁশিটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফুঁ দিল। এবার রাখালরা তাকে ঘিরে একটা গান গাইবে।

কিন্তু গান আর শুরু হলো না। অলিন্দে রীতিমতন একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। যবনিকার আড়ালে নারীরা শশব্যস্ত। জননী কৃত্তিকার কোলে মাথা ঢলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে রাধা। তাকে সবাই অন্দরমহলে সরিয়ে নিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। খবর পেয়ে রাজাও উঠে গেলেন। চলে গেল অন্যরাও। অভিনয় থেমে রইলো।

সোনার করঙ্ক থেকে জল ছেটানো হতে লাগলো রাধার চোখে মুখে। তবু তার কোনো সাড়া নেই। তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। চোখ দুটি নিষ্পলক। অনেকগুলি ব্যাকুল মুখ ঝুঁকে আছে তার দিকে। নানারকম সম্বোধনে জাগাবার চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে। কিন্তু সে যেন আর এ পৃথিবীতে নেই।

ডাকা হলো রাজবৈদ্যকে। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, নাড়ির গতি ঠিক আছে। শ্বাস সুস্থির আছে, গায়ের বর্ণ অবিকৃত আছে, তবে এ কী রোগ?

তাঁর বটিকা রাধার মুখের কশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। মুখ খুলছে না। ওষুধই যদি পেটে না যায়, তা হলে চিকিৎসা হবে কী করে?

তখন ডাকা হলো দেয়াসিনীকে। সে এলো তার জড়ি বুটির পুঁটলি নিয়ে। সেও রাধাকে পরীক্ষা করে বললো, একে তো ভূতপ্রেতে পায় নি। আমার চিকিৎসায় এর কোনো ফল হবে না। যদি হতো কোনো ভূত প্রেত দৈত্য দানো, ঠিক আমার মন্তরের জোরে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে বার করতুম কিন্তু এ তো অন্য অসুখ, এ অসুখ আমি চিনি না।

এদিকে মঞ্চের ওপর তখনও দাঁড়িয়ে আছে সুবলরা। ফাঁকা মণ্ডপ। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছে না। কানু ভাবছে, এত পরিশ্রম করে কী লাভ হলো? এত করেও তো তার দেখা পাওয়া গেল না।

এক সময় বৃন্দাকে যেতে দেখে সুবল দৌড়ে তার কাছে এসে বললো, ভাই বৃন্দে, সবাই কোথায় গেল? আমাদের খেলা আর কেউ দেখবে না।

বৃন্দা মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, না। কেউ দেখবে না। এখন বাড়ি যাও। আমার সই অসুখে পড়েছে।

সুবল ব্যগ্রভাবে বৃন্দার হাত চেপে ধরে বললো, রাধার অসুখ? কী অসুখ, আমাদের একটু বলে যাও।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বৃন্দা বললো, নির্লজ্জ, আবার কথা বলতে আসো। কেন তোমরা এখানেও এসে কানুর ঐ রূপ দেখালে আমাদের রাধাকে।

সে তো কানুরই অসুখ সারাবার জন্য।

বৃন্দা আর কোনো কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, সুবল তার পেছনে পেছনে গিয়ে বললো, তুমি অন্দর মহলে রাজাকে গিয়ে বলো, আমি শ্রীরাধার রোগ সারিয়ে দিতে পারি। আমি নিদান জানি।

এক সময় অন্দর থেকে সুবলের ডাক পড়লো। সে গিয়ে দেখলো মণিময় পালঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রাধা। তার চোখ খোলা কিন্তু পলক নেই। হেম বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু হয়ে গেছে। চুল ও বসন জলের ছিটোয় ভেজা।

সুবল গিয়ে রাধার শিয়রের কাছে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের মধ্যে সমাগত কৌতুহলীদের উদ্দেশে হাত জোড় করে বললো, আপনারা একটু নিভৃতি দিন।

ঘরটি জনমুক্ত হলে সে রাধার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, এক দেশে জন্মেছিল চম্পক, আর এক দেশে নীলকমল। তবু স্রোতে ভাসতে ভাসতে একদিন ওদের দেখা হয়ে গেল। ওদের মিলনই ছিল নিয়তি ।

রাধা একটুও নড়লো না।

সুবল আবার বললো, এক আঙুল মালা গাঁথে, আর এক আঙুল বাঁশি বাজায়। এখন মালাও গাঁথা হয় না, তাই তমালের নীচে কেউ আর বাঁশিও বাজায় না।

এবার রাধার শ্বাস একটু দ্রুত হলো, কিন্তু চোখের পলক পড়লো না।

সুবল আবার বললো. কেউ কনকশয্যায় শুয়ে কাঁদে। কেউ ভূমিশয্যায়। কিন্তু চোখের জল এক।

রাধা এবার চোখের পলক ফেলে সুবলের মুখে দৃষ্টি ন্যস্ত করলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো সে আমাকে আর মনে রাখে নি।

—তবে, সে এখানে এসেছে কেন?

—শুধু আমায় দুঃখ দিতে।

—শ্রীমতী, তুমি নিজের দুঃখটা বড় করে দেখলে, তার দুঃখটা দেখলে না? জীবনটা বড় ছোটো, আর যারা ভালোবাসে, তাদের সময় আরও দ্রুত চলে যায়।

—আমায় সে কাল-সীমার বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। আমি জানি না, কেন আমাদের গৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। সে কেন

দ্বার ভেঙে আসে নি ? আমি জানি না, কেন গোকুল থেকে আমাকে এখানে আনা হলো। সে কেন আমার পথ রোধ করলো না ?

—তোমার একদিনের অদর্শনেই তার কাছে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, সে আর কিছুই দেখতে পায় নি। তোমরা দু'জনেই অভিমানী, ভালোবাসাই এমন অভিমানের জন্ম দেয়।

—সে কি আর কোনোদিনও আমার কাছে আসবে ?

—সে তো তোমার কাছেই এসেছে।

—রাধা ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, আমি যাবো—

—কোথায় যাবে ?

—তার কাছে।

সুবল তাকে বাধা দিয়ে বললো, এখন না। এখানে তোমাদের দু'জনের দেখা হলে লোকনিন্দা হবে। তুমি তোমার গলার মালা থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে দাও কানুর জন্য। আজ থেকে ঠিক দু'দিন বাদে পূর্ণিমা, সেই পূর্ণিমার রাতে তুমি যমুনার ধারে তমালের নীচে এসো। সে আসবে। তুমি সঙ্কেতের জন্য একটা ছোট দীপ জ্বেলে রেখো—

রাধা বললো, আমি আমার সমস্ত দীপ জ্বেলে রাখবো। আর কেউ দেখবে না। শুধু সে দেখবে।

রাত্তিরবেলা রাজবাড়িতে ভুরিভোজ খেয়ে রাখালরা সেখানে ঘুমিয়েছে। ভোরবেলা তারা বাড়ির পথ ধরলো। তাদের মনে দারুণ ফুর্তি, তারা অনেক রকম উপহার পেয়েছে। তারা লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। কানুর ফুর্তি সবচেয়ে বেশী, কারণ সে শ্রীরাধার মন পেয়েছে আবার।

মাঠের মধ্যে রাস্তার ধারে সেই বৃদ্ধটি তখনও একই জায়গায় শুয়ে আছে, সে একই রকম ভাবে চেঁচাচ্ছে, জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল একটু জল দাও, বুক জ্বলে গেল।

একজন রাখাল বললো, আঃ এই বুড়োটা কি এরকম চ্যাঁচাতেই থাকবে? মরবেও না?

আর একজন বললো, বোধহয় এইটাই ওর সাধনার অঙ্গ। সাধুদের তো এ রকম অনেক কিছু বায়নাক্কা থাকে।

সুবল বললো, কাল আমি ওকে ভেবেছিলাম অপয়া। কিন্তু কাল ওকে দেখে গিয়েছিলাম বলেই বোধহয় আমাদের এত সুফল হলো।

কানু বললো, দাঁড়া আমি ওর জল তেষ্টা মিটিয়ে দিচ্ছি।

সবাই বারণ করলো, যাস নি কানু, যাস নি, ও অভিশাপ দেবে!

কানু বললো, দেখিই না, কেমন অভিশাপ দেয়!

কাছাকাছি একটা পুষ্করিণী থেকে একটা মৃৎভাণ্ডে খানিকটা জল নিয়ে কানু এগিয়ে গেল সেই বৃদ্ধের দিকে। তখনও কানু জানে না, এই প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সে তার জীবনের এক বিরাট পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে।

বৃদ্ধের চুল দাড়ি সব পাকা, পরনে টকটকে লোহিত বর্ণের এক টুকরো বস্ত্র, সে বাণবিদ্ধ পশুর মতন ছটফট করছে, তার কশের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফেনা।

কানু তার কাছে এসে বললো, এই নিন আপনার জন্য আমি জল এনেছি!

ছটফটানি থামিয়ে বৃদ্ধ রক্তবর্ণ চোখে তাকালো কানুর দিকে। তারপর কর্কশভাবে বললো, কাছে আসবিনা। ছুঁবি না আমাকে, ছুঁবি না, তা হলে শাপ দেবো—

কানু বললো, আপনার কাছে না এলে আপনাকে জল পান করাবো কী করে ?

ছুঁবি না আমায়, দূর হয়ে যা। অভিশাপ দেবো—

কানু একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বৃদ্ধকে জল পান করাবার গোঁ তার মাথায় চেপেছে, সে নিবৃত্ত হলো না। আবার এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললো, কাছে আসবি না! সাবধান! একবার অভিশাপ দিলে আর ফেরানো যাবে না।

কানু বললো, আপনি চিৎকার করে জল চাইছেন, আপনাকে জল দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনি অভিশাপ দেবেন কি দেবেন না—সে আপনার কর্তব্য বুঝে দেখুন।

জলের পাত্রটি নিয়ে কানু বৃদ্ধের মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো।

—ছুঁবি না আমায়। আগে তোর পরিচয় দে।

—আমি বৃন্দাবনের নন্দ ঘোষের নন্দন, আমার নাম কৃষ্ণ, আমি ধেনুপালক ··

—তুই একটা মিথ্যুক! তোর হাতের জল খেলে আমি মহা-পাতকী হবো।

কানু প্রথমে অবাক হলো। লোকটা তাকে মিথ্যুক বলে কোন্ সাহসে? এর মধ্যে মিথ্যেটা কোথায়!

তারপরই তার রাগ হলো। বৃদ্ধের এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করা যায় না।

সে বললো, দেখো বুড়ো। যদি স্বেচ্ছায় এই জল খেতে চাও তো খাও! নইলে আমি জোর করে তোমার চোয়াল ফাঁক করে তারপর মুখের মধ্যে জল ঢেলে দেবো, কিংবা তোমায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ফেলে দেবো পুষ্করিণীতে।

বৃদ্ধ এবার হাত তুলে কানুকে থামতে বলে নিজেই উঠে বসলো। তারপর একেবারে বদলে গিয়ে, খুব শান্ত ভাবে বললো, আমি তিনদিন ধরে এখানে শুয়ে চিৎকার করছি, এর মধ্যে কেউ আমাকে জোর করে জল পান করাতে আসে নি।

—আপনিই বা অভিশাপের ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন?

তৃষ্ণার্তকে জলদান মানুষের কর্তব্য কিংবা করুণা। তা কতখানি প্রবল? অলীক ভীতির কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। অর্থাৎ অধিকাংশ

মানুষই আত্মরক্ষণে যত্নবান। নির্ভীক ভাবে পররক্ষণের কাজ একজন বা দু'জনই পারে।

হঠাৎ বৃদ্ধের মুখে এরকম গুরুগম্ভীর কথা শুনে কানু চুপ করে বসে রইলো।

বৃদ্ধ তখন মুচকি হেসে নিজেই ভাণ্ডের সবটকু জল পান করে তৃপ্তিসূচক আঃ শব্দ করলেন, তারপর বললেন, হে বাসুদেব, আমি তোমারই প্রতীক্ষায় এখানে ছিলাম।

কানু আরও অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

বৃদ্ধ বললেন, আমি সান্দীপনি ঋষি। তোমারই জন্য আমি এসেছি।

—আপনি আমাকে বাসুদেব বলছেন কেন? আমার নাম তো—

বৃদ্ধ ভৎর্সনার দৃষ্টিতে বললেন, ছিঃ!

বৃদ্ধের অভিশাপে কানু পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি কিংবা ভেড়া বা গাভী হয়ে যায় নি দেখে অন্য রাখালরা ভরসা করে এবার কাছে চলে এলো। বৃদ্ধ তাদের বললেন, তোমরা যাও, এই যুবকের সাথে আমার কিছু গূঢ় কথা আছে।

তারা যেতে চায় না। কানুকে ফেলে রেখে তারা যাবে কেন? বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বললেন, যাও! এর জন্য ভয় পেও না। এর সঙ্গে আমার এমন কথা আছে যা তোমাদের সামনে বলা যাবে না।

তারা চলে গেলে, সান্দীপনি মুনি কৃষ্ণের জানু স্পর্শ করে বললেন, তুমি আত্মবিস্মৃত, তুমি নিজের পরিচয়ও জানো না। বাসুদেব, তুমি পৃথিবীতে অনেক বড় কাজের জন্য জন্মেছো, সামান্য যোষিৎ-সংসর্গে নিমজ্জিত হয়ে থাকা তোমায় মানায় না!

কানু বললো, আপনি কী বলছেন, আমি এখনো বুঝতে পারছি না!

—বৎস, তুমি কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছো। তোমার বাবা-মা কংসের কারাগারে পচছে। এবার তুমি তাদের উদ্ধার করে তোমার পুরুষকার প্রমাণ করো।

—আমার বাবা মা কংসের কারাগারে? কালও তো দেখে এসেছি বৃন্দাবনের ঘোষপল্লীতে—

—ওরা নয়! নন্দ আর যশোদা তোমার পালক পিতা মাতা মাত্র! তোমার মা রাজপুত্রী দেবকী, তোমার বাবা বিশিষ্ট গোষ্ঠী-

নেতা বসুদেব। তুমি ক্ষত্রিয়। গোপবালকের ছদ্মবেশ ছেড়ে এবার বাইরে এসো।

কানু বিমূঢ় হয়ে গেল। নন্দ যশোমতী তার বাবা মা নয়? একথা এতদিন কেউ তাকে বলে নি? সে ঝিম হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

সান্দীপনি মুনি আবার বললেন, তোমার জন্মরহস্য বিশেষ কেউ জানে না। তোমার জন্মরাত্রেই তোমাকে কারাগার থেকে লুকিয়ে এনে গোকুলে যশোদার কোলের কাছে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। যশোদা তখন ঘুমন্ত, কিছুই জানতে পারে নি। সেই রাত্রে যশোদারও একটি কন্যাসন্তান হয়েছিল, তোমার বদলে সেই কংসের জল্লাদদের হাতে প্রাণ দেয়। এবার তুমি সেই অত্যাচারের শোধ নাও, ধরণীকে পাপমুক্ত করো। তুমি এখানে সামান্য নারীর রূপের মোহে ভুলে আছো। কিন্তু পৃথিবীতে তোমার আরও অনেক বড় কাজ আছে। আর কালবিলম্ব না করে তুমি মথুরায় চলো। রাজা কংসও এতদিনে তোমার কথা টের পেয়ে গেছে, তুমি আর বেশীদিন আত্মগোপন করে এমনিতেও থাকতে পারবে না।

অনেকক্ষণ বাদে কানু নীচু গলায় প্রশ্ন করলো, আমাকে কি আমার এই পালক পিতা মাতাদের ছেড়ে যেতে হবে?

—তোমাকে আরও অনেক কিছুই ছেড়ে যেতে হবে।

—কিন্তু এত স্নেহ, এত ভালোবাসা।

—স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা—এসব বন্ধন তোমার জন্য নয়। তুমি যে নির্দিষ্ট! তুমি মহৎ কাজের জন্য নির্বাচিত।

কানু তবু সব কিছু অস্বীকার করার শেষ চেষ্টায় বললো, যদি আমি না যাই? কে আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে? যদি আমি এখানেই রাখাল হয়ে সুখে থেকে যাই বাকি জীবন? রাজচক্রান্ত, হানাহানি এসবের মধ্যে যদি নিজেকে না জড়াই কখনো?

ঋষি বললেন, তা আর হবার উপায় নেই, কানু সেই জন্য মথুরা থেকে আমি এসেছি তোমার বিস্মৃতি ভাঙাতে। তোমার অন্তরাত্মা জ্বালিয়ে দিতে। তুমি জোর করে এখানে থেকে যেতে পারো, কিন্তু সুখে আর কখনো থাকবে না। তোমার ভেতর সব সময় ধিকিধিকি আগুন জ্বলবে। তুমি কিছুতেই ভুলতে পারবে

না যে তুমি বন্দী পিতা-মাতার সন্তান। রাজরক্ত রয়েছে তোমার শরীরে, তোমার ওপর একটা মহৎ কাজের ভার ছিল —

আরও অনেকক্ষণ ঘোরলাগা অবস্থায় বসে রইলো কানু। সান্দীপনি মুনি যুদ্ধবিদ্যা থেকে শুরু করে রাজ্যপরিচালনা পর্যন্ত নানা বিষয়ে শ্লোক ও মন্ত্র শোনাতে লাগলেন তার কানে।

এরপর ঘটনা অতি দ্রুত ঘটতে লাগলো।

সেদিন গৃহে ফিরে আসতে আসতেই কানু দেখলো একটি রাজপতাকালাঞ্ছিত রথ দাঁড়িয়ে আছে তাদের কুটিরের সামনে। মহার্ঘ পোশাকে ভূষিত এক রাজদূত গম্ভীর ভাবে পায়চারি করছে সেখানে। উঠোনে অনেক ভিড়। রোহিণী, বলরাম এবং অন্যান্য গোপদেরও দেখা যাচ্ছে।

রাজদূত কানুকে দেখে সবিনয়ে বললো, আমি সংবাদবাহী অক্রূর। রাজা কংস আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি রথ নিয়ে এসেছি।

কানু চমৎকৃত হয়ে গেল। মাত্র এই এক-দু' দণ্ড আগে সে জেনেছে তার জন্মরহস্য, আর এর মধ্যেই রাজা কংসের দূত এসে গেছে? গতকাল যদি অক্রূর আসতো, কানু হয়তো দূর থেকে ঐ রথ দেখেই পালিয়ে বনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতো। কিন্তু আজ আর উপায় নেই। কংসের মুখোমুখি হওয়াই তার নিয়তি।

যশোমতী ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে কানুকে জড়িয়ে ধরে বললো, না কানু, তুই কিছুতেই যাবি না! কোথাও যাবি না! আমি তোকে আগলে রাখবো! দুরাচার কংস কতবার তোকে মারবার চেষ্টা করেছে। আমাকে না মেরে সে কিছুতেই তোকে নিতে পারবে না।

ঘরের দাওয়ায় বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে নন্দ। সে জানে, আর কোনো উপায় নেই। কয়েকদিন আগে তাকেও হাজিরা দিতে হয়েছে রাজা কংসের দরবারে। কংস বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি পুরুষকে নিয়ে গিয়ে জেরা করেছে। রাজা কংস জেনে গেছে কানুর প্রকৃত পরিচয়। সেইদিন নন্দও জানলো যে কানু তার নিজের সন্তান নয়! মুখ ফুটে যশোদাকে বলতে পারে নি একথা!

কানু যশোমতীকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললো, মা, ডাক যখন এসেছে, আমাকে যেতেই হবে!

যশোমতী আরও শক্ত করে তাকে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, না, না না, কেউ তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না ! তুই গেলে আমার মরা দেহের ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রোহিণী এসে যশোমতীকে জোর করে ছাড়িয়ে দিয়ে কঠোরভাবে বললেন, ছিঃ বোন ! এমন ব্যাকুল হলে কি চলে ? তোমাকে আমি বলেছিলাম না, একদিন কানুকে ছাড়তেই হবে। সে তো সারা জীবন রাখালি করার জন্য জন্মায় নি।

যশোমতী বললো, কেন ? তুমি তা বলবার কে ? কানু আমার ছেলে, আমি তাকে ছাড়বো না।

—কানু তোমার ছেলে নয় !

—অ্যাঁ ? কী বললে ?

যশোমতী তক্ষুনি সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়ে যাবে দেখে রোহিণী তাড়াতাড়ি বললেন, কানু শুধু তোমার একার ছেলে নয়, সে সকলের। সে আমাদের সকলের কত বড় গর্ব। সে কংসের-বিজয়ে যাচ্ছে।

কানু যশোমতীর হাত ধরে বললো, মা, আমি তোমার ! তুমি আশীর্বাদ করো, আমি ঠিক জয়ী হবো !

রোহিণী বললেন, কানু তো একা যাচ্ছে না। বলরামও ওর সঙ্গে যাবে। ওদের আরব্ধকাজ নিষ্পন্ন করার সময় এসেছে। ওরা দুই ভাই জগৎ জয় করবে !

ধীর সুস্থির বলরাম কানুর কাছে এসে বললো, চল কানু তুই আর আমি পাশাপাশি থাকলে ভয় কী ? পাগলা হাতিও আমাদের আটকাতে পারবে না !

রথের অশ্বদুটো অস্থির হয়ে মাটিতে ক্ষুর ঠুকছে। অক্রূর আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্ণয় করছে সময়। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক দূরের পথ।

কানু বুঝলো, আর দেরি করে লাভ নেই। গুরুজনদের প্রণাম করে সে বিদায় নেবার জন্য তৈরি হলো।

তখন সুবল কোথা থেকে দৌড়ে এসে বললো, দাঁড়া কানু, তুই মথুরায় যাবিই যখন, তখন এত সামান্য বেশে যাবি কেন ? তুই তো আমাদের রাজা ! রাজার মতন যাবি !

সুবল কানুকে রাজা সাজাতে লাগলো। পীত বস্ত্রের বদলে আজ পরিয়ে দিল সুদৃশ্য মখমলের পোশাক। গলায় ঝুলিয়ে দিল মুক্তামালা। বাহুতে বেঁধে দিল সুবর্ণ তাবিজ। কোমর-বন্ধে ঝুলিয়ে দিল তলোয়ার। কিন্তু মাথায় পরালো সেই ময়ূর পালকের মুকুট।

রাজবেশে কানু প্রণাম করলো যশোমতীকে। তার কম্পিত শরীর ধরে বললো, মা, চোখের জল নয়, আজ আশীর্বাদ দাও মা!

তারপর নন্দ, রোহিণী এবং অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে কানু বলরামকে সঙ্গে নিয়ে রথে উঠতে গেল।

শেষ মুহূর্তে সুবল কানুকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, কানু, তুই তো শ্রীমতি রাধিকার জন্য কিছু বলে গেলি না? তাকে আমি কী সান্ত্বনা দেবো? তাকে যে আমি তোর হয়ে কথা দিয়ে এসেছি!

গলায় বাষ্প এসে গিয়েছিল, অতিকষ্টে তা সংযত করে কানু বললো, রাধাকে বলিস, আমার কাজ শেষ করে আমি ঠিক ফিরে আসবো। আমি রাধার কাছে ফিরে আসবো। দেখা হবে সেই যমুনার তীরে, তমাল গাছের তলায়, পূর্ণিমা রাত্রে···

ঘর্ঘর শব্দে রথ চলে গেল বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরার দিকে।

কানু আর আসে নি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কংসকে নিহত করে সে মথুরার রাজা হয়েছে। যাদবদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার ভার পড়েছে তার ওপর। সে এখন সদাব্যস্ত। কত প্রার্থী, গ্রহীতা, অসহায় ব্যক্তিরা আসে তার কাছে সাহায্য চাইতে। রাজ্যে ন্যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজে সে অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত। তাছাড়া আরও শত্রুদমনের কাজ বাকি আছে। মহাবল জরাসন্ধের ক্রোধ থেকে মথুরাকে রক্ষা করাও কম কথা নয়। শোনা যায়, সে নাকি রাজধানী মথুরা থেকে সরিয়ে অনেক দূরে, দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে সুদৃঢ় করতে চাইছে।

বৃন্দাবনে সে আর আস নি। এতদিন যেমন সে তার জন্মপরিচয় বিস্মৃত ছিল, এখন সে যেন তার বাল্য কৈশোরের এই অধ্যায়টিও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। কত পূর্ণিমা এসেছে, তারপর অমাবস্যা, আবার পূর্ণিমা। অমাবস্যা হয়েছে চন্দ্রাভুক্, আবার চন্দ্রকিরণ ভক্ষণ করেছে আঁধার। আকাশে দেখা দিয়েছে নবীন মেঘ, মাটিতে পড়েছে নীলবর্ণ ছায়া, তখনও কানু আসে নি। কদমগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, তমাল গাছের নীচে জ্বলছে দীপ, কানু আসে নি। চোখের জলে একটি নদী বানিয়ে রাধা তার পাশে শুয়ে থেকেছে।

একবার বৃন্দা আর সুবল গিয়েছিল দূত হয়ে কানুর কাছে। কানু ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের। রাজার অনুচর প্রতিহারীরা এইসব গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সহজে দেখাই করতে দিতে চায় না। কংসের কী বিশাল প্রাসাদ—তার মধ্যে যেন পথ হারিয়ে যায়। প্রতিটি ঘরের মেঝে দর্পণের মত ঝকঝকে, বিরাট বিরাট অলিন্দ, তার মধ্যে মধ্যে রত্নখচিত মিনার। আজ কানু এই সবকিছুর অধিপতি। সে যেখানেই যায় তার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা ফেরে। তবু কানু বৃন্দা আর সুবলকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে রাজপ্রাসাদের নিভৃততম ঘরে। প্রথমে কেউ কোনো কথা বলতে পারে নি। একটু পরে কানুই প্রথমে মৃদু গলায় প্রশ্ন করেছিল, ওখানে সবাই ভালো আছে?

সুবল আর বৃন্দা দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না !

ওরা দুজনে ভেবেই পায় না কানুকে কী বলে সম্বোধন করবে ! এতদিন তারা কানুর নাম ধরে যে ডেকেছে সে কথা ভেবেই লজ্জা পায়। সে কানু তো আর নেই। সে এখন রাজা, এখানে তাকে দেখলে সবাই ভক্তিসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়, কেউ তার নামও উচ্চারণ করে না।

দুয়ারের পাশ দিয়ে রাজমাতা দেবকীকে দেখে সুবলরা অকারণেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। যেন তারা কানুকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে। বাইরে থেকে অমাত্যরা উঁকি দেয় মাঝে মাঝে। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজাধিরাজ কৃষ্ণের জন্য রাজকার্য অপেক্ষা করে আছে।

একসময় সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সুবল জিজ্ঞেস করলো, ভাই কানু তুমি কি আর একবারটিও আমাদের ওখানে যাবে না ? কানু সুবলের হাত চেপে ধরে কম্পিত গলায় বলতে লাগলো, ভাই সুবল বৃন্দাবনের জন্য আমার মন কাঁদে, সেখানকার সকলের জন্য আমার মন কাঁদে, কিন্তু সে-বৃন্দাবন আর আমার জন্য নয় ! আমি আর ফিরতে পারি না। আমার ফেরার পথ নেই। যদি বৃন্দাবনে যাই, আর কি তাহলে গোষ্ঠে গিয়ে ধেনু চরাতে পারবো ? আর কি তোদের সঙ্গে ধুলো মেখে খেলতে পারবো মায়ের মতন মাটিতে ? আর কি কখনো যমুনায় একা নৌকো বাইবো ? স্নানের ঘাটে গিয়ে সঙ্কেতবাঁশি বাজাতে পারবো রাধার জন্য ? আমি রাজা, কোনো রাজার পক্ষে কি এসব মানায় ? তা হলে যে শাসন দুর্বল হয়ে যাবে ? আর ঐ সবই যদি না করতে পারি, তা হলে বৃন্দাবনে যাবো কোন সাধে ? আমার বুক হু-হু করবে না ? এই রাজ পোশাকের পিঞ্জরে আমাকে আটকে দিয়েছে সবাই। সুবল, তোরা দেখে যা আমাকে, সবাইকে গিয়ে বলিস !

মা যশোদার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। কিন্তু মা দেবকীকে কাঁদিয়ে কী করে আমি যশোদার কাছে ফিরে যাই ? একজন অনেক বছর কাছে পেয়েছে, আর একজন যে একদিনও পায় নি।

আর রাধা ?

সুবল, তোরা রাধাকে বলিস, আমি মন-পবন গগনে রেখেছি। এখন দশমী দুয়ারে কবাট। আমি মূল কমলে মধু পান করেছি,

আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তাই জ্ঞানবাণে মদনবাণ ছিন্ন না করে পারি নি। আমি অহর্নিশ যোগধ্যান করি, আমার দেহে আর বিকার নেই। তবু তোরা বলিস, সেই সুন্দরের প্রতিমাকে আমি কখনো ভুলবো না।

ওরা ফিরে এসে রাধাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। রাধা এসব কথা কিছুই কানে নেয় না। কেউ কাছে এলে সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এখন আর সে কাঁদে না।

প্রতি পূর্ণিমার রাতে সে সাজাতে বসে। কুঙ্কুম চন্দনের আলিপন দেয় শরীরে। হাতে, পায়ে, গলায় পরে নেয় ফুলের গহনা। তারপর চুপি চুপি চলে যায় যমুনা তীরে। তমাল গাছের নীচে দীপ জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকে। সে আসবে বলে কথা দিয়েছিল, তাই রাধাকে যে অপেক্ষায় থাকতেই হবে।

একসময় মনে হয়, যেন দূরে কোথাও বেজে ওঠে সেই পাগল-করা বাঁশি। সেই সুর বাতাসে কাঁপে এবং রাধাকে কাঁপায়। যমুনার জল কাঁপে, তমালের পাতা কাঁপে। তারপর এক সময় মনে হয় সেই দুরন্ত দুর্দান্ত মেঘবর্ণ ছেলেটি ছুটে ছুটে আসছে বন পাথার পেরিয়ে! একসময় সে রাধার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর হাসিতে কান্নায় আদরে-সোহাগে মানে-অভিমানে রাত ভোর হয়ে যায়। এ রাধার একান্ত নিজস্ব কানু, এ তাকে ছেড়ে থাকবে কী করে?

মথুরায় যে রাজত্ব করছে, সে রাজত্ব নিয়েই থাকুক। সে অন্য কৃষ্ণ। সে রাধার কেউ নয়!

।। সমাপ্ত ।।

এই কাহিনী রচনায় শ্রীশ্রীভাগবত, শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, রাস পঞ্চাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য পদকর্তাদের পদাবলী, বিভিন্ন লোক সঙ্গীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচনাবলী থেকে প্রভূত উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে।